KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication সি ১৩, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় লিং, কল-৬৩
Collection : KLMLGK	Publisher আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ১১/2	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫
	Condition : Brittle Good ✓
Editor হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
আশ্বিন ৫. ১৩৫৬
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

সম্পাদক : হুমায়ুন কবির

বার্ষিক ৪.৫০ প্রতি সংখ্যা ১.২৫

একাদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র
লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র

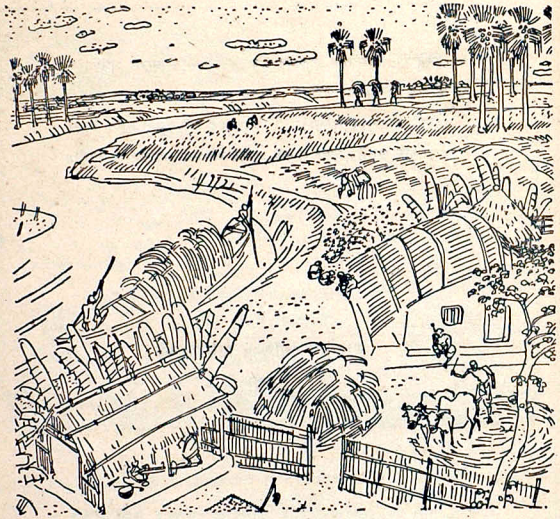

শরৎ

বাদলধারা শেষ হয়ে গেল। স্বচ্ছ নীল আকাশে ভেসে চলেছে রাশি রাশি শাদা মেঘ, নীচে বয়ে চলেছে শান্ত নদীর নির্মল জলরেখা। আলো-ঝলমল পথে শরৎ নেমে এলো, বেজে উঠলো আগমনীর বাঁশিটি। মানুষ সাড়া দিয়েছে তার আহ্বানে, তাকে বরণ করে নিয়েছে অফুরান নৃত্য গীতের উচ্ছলতায়। নগরে, গ্রামে, সর্বত্র আজ আনন্দের আসর বসেছে। উষ্ণ চায়ের মিষ্টি গন্ধে উৎসবের মুহূর্তগুলি ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

চা

সব সময়েই চলে

ITX 319

চতুরঙ্গ

[একাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৫৬]

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আমরা তা হলে কী করব

অন্নদাশঙ্কর রায়

১৯১৭ সালে ছুনিয়ার যেখানে যত ধনপতি ছিলেন সকলের বুকের রক্ত মুখে উঠল। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন আকাশে এক ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। প্রথম প্রথম তাঁদের ধারণা ছিল ইতিহাসের গগনে অমন কত উদয় হয়েছে, উদয়ের পর অস্ত গেছে। এবার কিন্তু অস্ত যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তখন তাঁরা শঙ্কিত হলেন। এ কি তা হলে সেই ধূমকেতু জয়দেব কবির কল্পনায় যে ছিল কল্কি অবতারের প্রতিরূপ?

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃতকল্কিশরীর। জয় জগদীশ হরে।

শঙ্কা সবচেয়ে বেশী জার্মান ধনপতিদের। কারণ ১৯১৮ সালে তাঁদেরও ঘরোয়া আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল, স্থিতি হয়নি। আবার যদি আসে! পাশের বাড়ীর আকাশে যিনি জ্বলছিলেন তিনি যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তাঁরা প্রমাদ গণলেন। এই সময় এক রণপতির আবির্ভাব ঘটে। ইনি দশ বারো বছর ধরে এই লগ্নটির জন্যে পঁয়তারা কষছিলেন। স্বদেশের গণপতিদের ঠেঙিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেবার পর

এঁর এমন বাড় বাড়ল যে ধনপতিরা সহজেই বিশ্বাস করলেন এঁর মতো লাঠিয়াল থাকতে ধুমকেতুর ভয় নেই।

কিন্তু জার্মানীকে শক্তিসঞ্চয় করতে দেখে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিশ্বাস হলো না যে মুদগরটি শুধু স্বদেশের গণপতিদের উরুভঙ্গের পর শান্ত হবে। রাশিয়ারও বিশ্বাস হলো না যে জার্মানীর রণবল সন্ধিনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে। আরেক দফা বলপরীক্ষার জন্যে ইউরোপের মহাশক্তিরা প্রস্তুত হতে লাগলেন। তারপর যা ঘটল তা ধাপে ধাপে যুদ্ধের দিকে এগোনো। শেষে যুদ্ধ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রমিকরা যেভাবে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে কাজে লেগে গেল তা লক্ষ্য করে সেসব দেশের ধনপতিদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ধরো, যুদ্ধের পরে যদি এই লক্ষ্মী ছেলেগুলিকে অধিকতর অন্নবস্ত্র দেওয়া হয় তাহলে কি এরা অধিকতর পরিশ্রম করে অধিকতর উৎপাদন করবে না? তা যদি করে তবে আর ভাবনা কিসের? সমস্যার সমাধান তো হয়েই রয়েছে। ইংলণ্ড আমেরিকার ধনপতিদের সঙ্গে সেসব দেশের গণপতিদের যেমন গলায় গলায় ভাব তা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে মার্ক্স্ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী সেসব দেশেও সত্য হবে। কিন্তু যদি জার্মানীতে হয়! না, তা হতে দেওয়া হবে না। জার্মানী দখল করতে হবে। ততকাল ধরে দখল যত কাল সঙ্কটের আশঙ্কা। জার্মানী যদি রাশিয়ার পথ ধরে তবে ফ্রান্স কি ধরবে না? ফ্রান্স যদি সে পথের পথিক হয় তবে ইংলণ্ড কি বিপথগামী হবে না? আর ইংলণ্ড যদি গোল্লায় যায় আমেরিকা কি সঙ্গদোষ এড়াতে পারবে?

সেইজন্যে জার্মানী দখল করার জন্যে যেন আমেরিকারই গরজ সবচেয়ে বেশী। অবশ্য এর সঙ্গে জুটেছে প্রতিযোগী যন্ত্রশিল্পকে করতলগত করার অভিসন্ধি। এবং রাশিয়ার সঙ্গে ব্যালান্স অফ পাওয়ার। আস্ত জার্মানীটাই যদি রাশিয়ার দিকে ঝোঁকে তাহলে বাটখারার ভারসাম্য থাকে না। সমস্তটা দখল করতে পারলেই চমৎকার হতো, কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

ওদিকে যেভাবে উৎপন্ন সামগ্রী অগ্নিসাৎ হচ্ছে অধিকতর উপাদানসত্ত্বেও উৎপাদক শ্রেণীর উদর ও পৃষ্ঠ অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে আসছে। যুদ্ধটা এইবেলা মধুরেণ সমাপয়েৎ হলেই বাঁচি। যদি আরো দু'বছর গড়ায় তা হলে ঐ যে মধুর সমাধানটি ওটি তেমন মুখরোচক হবে না। শ্রমিক যখন বখরা

চাইবে ধনিক বলবেন, "তুমি তো বড় লক্ষ্মী ছেলে নও হে।" তখন ক্যাপিটালিজম ছদ্মবেশী ফাসিজম হয়ে উঠবে। ঠিক এই অভিজ্ঞতাটি ভারতবর্ষেরও হতে পারে। যদি হয়, তবে আমরা কিন্তু উভয়সঙ্কটে পড়ব।

সঙ্কটের দিন আমরা যারা মধ্যবিত্ত আমরা কি কোনো একটা পক্ষ নেব? না আমরা বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী হব? এ ছাড়া আরো দুটো বিকল্প আছে। এক, দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখা। দুই, দু'হাত দিয়ে দু'পক্ষকে ধরে ছাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতে বিপদ আছে। দু'পক্ষের চাপে গুঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর। পাঠক, তুমি হয়তো সরে দাঁড়াবে, আমি কিন্তু সেটি পারব না। আমি ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হয় দু'হাত দিয়ে ওদের ছাড়াছাড়ি ঘটাব, নয় দু'পক্ষের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাব। আমি মধ্যবিত্ত না, মধ্যস্থ হব বলে স্থির করে রেখেছি। যদি দরকার হয়। মধ্যবিত্তরা দু'পক্ষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যায়। আর মধ্যস্থরা খায় দু'দিক থেকে মার। মধ্যস্থ যারা হবে তারা ন্যায়পরায়ণ হবে। তারা পদে পদে ন্যায় অন্যায় বিচার করবে, যার অন্যায় তাকে সেকথা বোঝাবে, যার দিকে ন্যায় তাকে নৈতিক সমর্থন জানাবে, এবং এর দরুণ উভয় পক্ষের লাথিটা কিলটা বথশিষ পাবে। তাদের কপালে আর কোনো পুরস্কার নেই।

২

উপরের অংশটি যুদ্ধের সময় লেখা। বোধহয় ১৯৪৪ সালের শেষে কিম্বা ১৯৪৫ সালের প্রারম্ভে। তারপর আমার অলক্ষে আমার একখানা পুরোনো খাতার পাতায় লুকিয়েছিল। এই সেদিন নজরে পড়ল। অল্পস্বল্প পরিবর্তন করে প্রকাশ করছি।

এখন এই পাঁচ বছরের হিসাব নিকাশ করা যাক।

আমেরিকা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। জার্মানীর আধাআধি দখল করে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইংলণ্ড যা চেয়েছিল তা পায়নি। বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তার নিজের ঘরেই ছোটখাট একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। তার সাম্রাজ্যের একাংশ স্বাধীন হয়েছে। সেও একরকম বিপ্লব। তা হলেও ইংলণ্ড এখনো তার সনাতন ব্যালান্স অফ পাওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসবান। জার্মানীকে সে উঠতে দেবে না। জার্মানদের শক্তিবৃদ্ধি দেখলেই সে ভয় পাবে। তারা নাৎসী হলেও যে ভয় তারা কমিউনিস্ট হলেও সেই ভয়। এমন কি

তারা অখণ্ড হলেও সেই ভয়। জার্মান জাতিটাই একটা আতঙ্ক, কেবল ইংলণ্ডের চোখে নয়, ফ্রান্সের চোখেও। অথচ জার্মানীকে চিরকাল পার্টিশন করে রাখা যাবে না। ইংরেজ ফরাসী কি তা বোঝে না? বোঝে ঠিকই। কিন্তু ভয় যে যায় না।

জার্মানীর বল ধীরে ধীরে ফিরছে। আর কয়েক বছর পরে সে যদি ইচ্ছা করে তবে নিজের চেষ্টায় অখণ্ড হতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা কি তার আছে? ইচ্ছা যেমন বাঙালী হিন্দু মুসলমানের নেই তেমনি জার্মান নাৎসী কমিউনিস্টের নেই। একদা যেমন প্রোটেস্টাণ্ট ক্যাথলিক মিলে জার্মানীকে খণ্ড খণ্ড করেছিল এখনো তেমনি নাৎসী কমিউনিস্ট মিলে করতে পারে। জার্মানীর নিজস্ব অন্তর্বিরোধ তার অখণ্ড হবার ইচ্ছা কেড়ে নিয়েছে। তার অন্তর্বিরোধের নিষ্পত্তি সেবারে তো হয়নি, এবারে কি হবে! যতদূর দৃষ্টি যায় জার্মানীকে বিভক্ত হয়েই থাকতে হবে, তবে পরাধীন হয়ে নয়। তার পরাধীনতার শিকল খসে পড়বে।

ওদিকে বৃহত্তর পটভূমিকায় শক্তিপরীক্ষার যে আয়োজন চলছে তা লক্ষ করে কেউ স্থির থাকতে পারছে না। প্রত্যেককেই চিন্তা করতে হচ্ছে, আমি কোন পক্ষে যাব। চীনারা ইতিমধ্যেই এর একটা উত্তর দিয়েছে। ওরা কমিউনিস্ট হয়েছে, রুশ পক্ষে যাবে। ভারতীয়রা মুখে বলছে, আমরা কোনো পক্ষে যাব না। আমরা কমিউনিস্টও না। কথাটা সত্য। সুতরাং অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। কিন্তু এখনো আমাদের টিকি ইংরেজদের পাউণ্ড স্টার্লিংএর সঙ্গে বাঁধা। আর্থিক বিপর্যয়ের ভয়ে আমরা কোনদিন কী করে বসব তা আমরাই চব্বিশ ঘণ্টা আগে জানতে পাব না। এটা যে সত্য তা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? ডিভ্যালুয়েশনের নাটকীয়তা এখনো বাসি হয়নি।

আর্থিক বিপর্যয় এড়িয়ে চলতে চাই, এই যদি আমাদের মনের কথা হয় তবে মুখের কথা যাই হোক না কেন যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হব। অপর পক্ষে, যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাই, এই যদি আমাদের মনের কথা হয় তা হলে আর্থিক বিপর্যয়ের জন্যে এখন থেকে মনটাকে তৈরি করতে হবে। তার মানে পাউণ্ড স্টার্লিংএর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক এক দিন না এক দিন কাটাতে হবে ও তার ফলভোগ করতে হবে। পাকিস্তান পাউণ্ডের মায়া কাটিয়েছে, কিন্তু ডলারের মমতা কাটায়নি। ডলারের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেমনি রয়েছে।

তার দাড়ি ডলারের সঙ্গে বাঁধা। তাকেও মনঃস্থির করতে হবে, কোনটা শ্রেয়ঃ। যুদ্ধে যোগদান, না আর্থিক বিপর্যয়।

ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সম্মুখে এই একই প্রশ্ন। এত বড় প্রশ্ন আর নেই। কে কী ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেয় তার উপর নির্ভর করছে সমস্ত ভবিষ্যৎ। উত্তর দেওয়া যে কত কঠিন তা আমি জানি ও বুঝি। কিন্তু তা বলে নিরুত্তর তো থাকা যায় না। এক দিন না এক দিন উত্তর আমাদের দিতেই হবে। উত্তর যদি হয় যুদ্ধে যোগদান তা হলে আর্থিক বিপর্যয় হয়তো ঘটবে না। কিন্তু বাধবে অন্তর্বিরোধ। ভারতের আত্মা যুদ্ধ চায় না। ভারত শান্তিকামী। ভারতের জনগণ একটা যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেছে গান্ধীনেতৃত্বে। আরেকটা যুদ্ধের প্রতিকূলতা করবেই, কার নেতৃত্বে জানিনে।

পক্ষান্তরে যুদ্ধে যোগদান না করলে আর্থিক বিপর্যয়ের জন্যে দেশশুদ্ধ লোককে সময় থাকতে প্রস্তুত করতে হবে। অতি দুরূহ কাজ। খাদ্য আমদানি বন্ধ হতে যাচ্ছে, এক এক করে অনেক কিছুর আমদানি বন্ধ হবে। আমদানি বন্ধ হলে রপ্তানি বন্ধ হতে বাধ্য। দেশের কাঁচামাল দেশের কলকারখানায় ব্যবহার করতে হবে। কলকারখানারও বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হবে। তাতে বণ্টনের সুবিধা।

সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ ও প্রচলন কমাতে হবে। বিনিময় চলবে যথাসম্ভব বার্টার প্রথায়। এবং চরকার সুতোর মাধ্যমে। বাড়ীতে বাড়ীতে শিল্প ও কৃষি চর্চ্চা ব্যাপক হবে। পরচর্চ্চার সময় থাকবে না। সিনেমার টিকিট পেতে হলে চরকার সুতো দাখিল করতে হবে। পরিবারের সকলে যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে খায় তা হলে রান্নার সময় বাঁচে, কয়লার খরচও। কয়েকটি পরিবার মিলে একসঙ্গে রান্নার আয়োজন করতে পারেন। রোজ না হোক হপ্তায় এক দিন।

ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। যুদ্ধে যোগদান করব না এই যদি হয় সংকল্প তা হলে তার আনুষঙ্গিক আর্থিক বিপর্যয় আমাদের অকল্যাণ করবে না। বরং আমরা সেই সুযোগে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করব। সে ব্যবস্থার সার কথা, যে কাজ করতে চায় সে কাজ পাবে, যে কাজ করতে চায় না সে দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাবে। আমরা কাউকে বসে থাকতে দেব না। এমন কি সাধু সন্ন্যাসীকেও না। তাঁরা ইচ্ছা করলে হিমালয়ে যেতে পারেন, কিন্তু লোকালয়ে থাকলে কাজে হাত লাগাতে হবে। কয়েক জন খাটবে আর বাকী সকলে

খাবে, এ ব্যবস্থা আমাদের পারিবারিক জীবন দুর্বহ করেছে, আমাদের জাতীয় জীবনকেও দুর্বহ করে তুলবে। যারা রেশন পাচ্ছে তারা খেটে খাচ্ছে কি না খবর নিতে হবে। যদি দেখা যায় খাটছে না তা হলে খাটুনির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা যে কলকাতা শহরেই হবে এমন কোনো কথা নেই। অধিকাংশকেই গ্রামে চালান দিতে হবে। না গেলে রেশন মিলবে না।

এ দেশের প্রধান শত্রু জড়তা। স্বাধীন হয়েও এর জড়তা কাটেনি। জড়তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্ধ কুসংস্কার। ধর্মের নামে তার অসীম প্রতিপত্তি। সে যদি দেশের চিত্ত অধিকার করে থাকে তা হলে আমাদের জড়তা ও আমাদের যুঢ়তা মিলে আমাদের দুই হাত ও দুই পা জড়িয়ে ধরবে। আমরা খাটতে পারব না, আমরা হাঁটতে পারব না। কেবল বক্তৃতা দেব, কেবল বিবৃতি ছাপাব। তার পর অবস্থা যখন ঘোরালো হয়ে উঠবে তখন ফস্ করে এক দিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব। যেন যুদ্ধই সব সমস্যার সমাধান।

অবশ্য আমি ধরে নিয়েছি যে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। অনেকের বিশ্বাস দু'পক্ষেরই যখন আণবিক বোমা আছে তখন কেউ সাহস করে লড়াই শুরু করবে না। কিন্তু জার্মানী কি জানত না যে প্রতিপক্ষের বিষবাষ্প আছে? কেন তা হলে লড়াই শুরু করল? করল এই জন্যে যে সেই মুহূর্তে তার বল ছিল তার প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশী। দেরি করলে তার প্রতিপক্ষের বল তার চেয়ে বেশী হতো। অর্থাৎ তার প্রতিপক্ষের বল যে হারে বাড়ছিল তার নিজের বল সে হারে বাড়ছিল না। বল পরীক্ষায় সে হেরে যেত, যদি দেরী করত। শেষ পর্যন্ত হেরে গেল এই জন্যে যে তাড়াতাড়ি শুরু করলেও তাড়াতাড়ি সারা করতে পারল না। সারা করতে তার যতই দেরি হতে থাকল তার প্রতিপক্ষদের বল ততই বাড়তে থাকল। আসছে বারের যুদ্ধ সেই আরম্ভ করবে যার বল একটা বিশেষ মুহূর্তে প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশী থাকবে, পরবর্তী মুহূর্তে থাকবে না। আণবিক বোমাই সামরিক বলের একমাত্র মাপকাটি নয়। দু'পক্ষের বল যদি সমস্তক্ষণ সমান থাকে তা হলে অবশ্য কেউ আরম্ভ করবে না, উভয়েই অপেক্ষা করবে। কিন্তু বল কখনো সমস্তক্ষণ সমান থাকে না। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য।

যদি না ইতিমধ্যে অন্তঃপরিবর্তন ঘটে। তার সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। গান্ধীজী আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন অন্তঃপরিবর্তনে বিশ্বাস রাখতে। আমরা বিশ্বাস রাখব।

কবিতা

বিপ্লব

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুনি বজ্রের রোষ-বাণী,
পরি তড়িৎ-কিরীট-খানি,
আমি অনন্ত যামিনী,
প্রলয়-সিমন্তিনী,
আমি মহা-প্রলয়ের বিরাট ঝঞ্ঝা অসীম তৃষ্ণাভরে
আকাশ-পাথারে তারকার ঢেউ লই নিতি পান ক'রে।

ধরি মহাকাল-কটি
আমি মরণের নটী,
নৃত্যের প্রতি তালে
জ্বালি চিতা যুগ-ভালে,
ধরি' বাসুকীর ফণা বুলাই সুখেতে ধরণীর বুকপরে,
বিষ-জর্জর ধরণীর ব্যথা দেখি মহাসুখ ভরে।

আমি মরু-রঙ্গিনী,
অনন্ত-নন্দিনী,
মরীচিকা-সঙ্গিনী,
পায়ে বালু-কিঙ্কিনী।
থাকি সূর্যের সাথে খর্জুর-ছায়ে সড় করে আড়ি পেতে,
পথিকের ছায়া লেহন করিয়া আনন্দে উঠি মেতে।

আমি মহাভবিষ্যরূপী,
সৃষ্টির বহুরূপী,
ভাঙ্গন সর্বনাশী,
সৃষ্টির মহা-আশা।
আমি সর্বনাশার করাল ঢেউয়ের নিঠুর অট্টহাসি।
কূল ভাঙ্গি আমি অকূল স্রোতেতে লই দুই তীর গ্রাসি'।

আমি গোকুলের মন্দার,
নন্দন যশোদার,
পূতনার বিষ হেসে
শুষে নিই নিঃশেষে,
লোভ-পঙ্কিল পূতনার বিষ যুগে যুগে নিই টেনে,
বিশ্ব-মানবে বাঁচাই গো আমি লোভেরে মৃত্যু হেনে।

আমি ক্ষুধিত বৈশ্বানর,
শিখার রসনা মোর।
খাণ্ডব দাহ করি'
পাপের দম্ভ হরি।
আমি যজ্ঞ-অগ্নি, ত্র্যম্বক-আঁখি, কালের ভালের টীকা,
মহাকাল-হাতে আমিই মশাল, নির্বাণহীন শিখা।

আমি অন্ধ তরুণ আঁধি
দিগ্‌বধূদের চক্ষেরে দিই ধাঁধি,
আকাশের নীল আঁখি
গেরুয়ায় দিই ঢাকি'
শূন্যের পরে মহা-আনন্দে ধূলি-আল্পনা আঁকি,
ঝরে-পড়া সব পত্রপুষ্পে মোর বুকে লই ডাকি'।

আমি মহাসত্যের অসি
চলি উলঙ্গ নিষ্কোসি,'
ভোগীর বুকেতে বসি'
হাত রক্তেতে মাজি ঘসি,

আমি কুন্তী-তনয় ভীম মহাবল দুঃশাসনের বুকে
অসির ফলকে পঞ্জর ভেদি' ডাকি রক্তেরে সুখে।

আমি ভিক্ষুণী সুজাতা,
বেদনা-করুণা-গাথা,
অন্নের থালি হাতে
ফিরি পথে পথে প্রাতে
লয়ে লোভীর শেঠীর ভোগের অন্ন হরি,'
শুষ্ক-অধর ভুখা মানবের চির-ক্ষুধা অপহরি।

আমি পাঞ্চজন্য শাঁখ,
আমি বন্যার মহাডাক,
সমর-ঝটিকা গান,
দীপক রাগিনী তান,
ছাড়ি' যুগের মোহানা মানব-যাত্রী যাত্রা করেছে সুরু,
অজানা সে পথ, অজানা ভুবন, শাঁখ ডাকে গুরু গুরু।

সৃষ্টির আদি ধরি'
আমি যুগ-প্রহরী,
কালের বক্ষে পশি'
পথ-বাঁকে থাকি বসি',
যেমনি ভুবন যুগ-পথ-শেষে থমকি দাঁড়ায় এসে,
বিপ্লবানলে মশাল জ্বালিয়া পন্থা দেখাই হেসে।

যুগ যেই মোড় ঘোরে,
যাত্রাটি সুরু করে,
অমনি কোমল হই,
নীল আকাশের কথা কই,
আমি সৃষ্টির বেশ করি পরিধান ভাঙনের বেশ ছাড়ি',
প্রজাপতির হাল্‌কা ডানার নৌকায় দিই পাড়ি।

জ্বালি স্তব্ধতা-ধূপ,
আমি সৃজনের ঘন রূপ,

আঁধার-সুরভি-শ্বাসে,
ঢাকি আমি মহাকাশে,
মহাধ্বংসের অবসান শেষে পথচারী শঙ্কর,
সতীর দেহেরে ঘূর্ণি হাওয়ায় ছড়াই ভুবন পর।

বসি আঁধার-পদ্মাসনে,
সৃষ্টির ধ্যান মনে,
নিখিল ভুবনখানি
গুটায়ে বুকেতে আনি
আমি ধ্যানী, আমি মহান স্রষ্টা, বিশ্বের প্রজাপতি,
পথ-সন্ধানী, আলোক-চেতন, সৃষ্টির মহাব্রতী।

আমি জীবন-মন্দাকিনী
হাতে আলো-শিঞ্জিনী,
আঁধার-উপল 'পরে
বহি আমি স্রোতভরে,
বিশ্বের গ্লানি ধুয়ে দিই আমি গতির ছন্দভরে,
নিখিল-অধরে শ্যাম হাসিখানি তাই নিতি ঝরে পড়ে।

আমি ঘুম-ভাঙা শিশু-আঁখি
নব-প্রভাতের আলো মাখি,
হেরি নির্মল মহাকাশ,
লই নবজীবনের বাস,
অতীতের ঘন তামসী রাত্রি পঙ্গু অন্ধ ভয়,
মিলায়ে গিয়াছে স্বপনের মতো, হেরি আলোকের জয়।

হাতে পঞ্চপ্রদীপ-ডালা
আমি এই প্রভাতের বালা,
নব জীবনের ললাট-ফলকে
ভাই ফোঁটা দিই দুর্বাতিলকে
আমি বধূ, আমি দুহিতা, জননী, আমি নারী মহীয়সী,
বন্ধন-ডোর ভয়ে পড়ে গেছে নবজীবনেতে পশি'।

আমি চাষী হলধর,
মরু ভাঙ্গে মোর কর,
প্রান্তরে করি চাষ,
শুনি শস্যের ফিস্‌ফাস,
আমি প্রথম স্রষ্টা, মহীয়ান হোতে বাল্মীকি মহাকবি,
আমারি ধানের উত্তাপে ফোটে কাব্যের মহারবি।

হালের মন্ত্রবলে
ডেকে আনি ফুল-ফলে,
সেই ফল, সেই মাটি,
দস্যুরা লয় বাঁটি',
দশানন-মুঠি টুটায়ে এবারে সীতারে লইব হরি',
তারি তরে মোরা যুগ হোতে যুগে সেতু-বন্ধন গড়ি।

আমি শ্রমিক যন্ত্রধর,
এই যুগ মোর কিঙ্কর,
যন্ত্রে আগুণ পুরি',
রচি ধাতু-ফুলঝুরি,
এই যুগে আমি প্রধান স্রষ্টা, আমি এই যুগ-কবি,
আমারি হাতেতে যুগের কেতন, আমি উষার রক্ত রবি।

আমি শ্রমিক চক্রপাণি
কালের চক্রখানি
এবে মোর করতলে,
মোর কথা মেনে চলে।
লুটের মালিক যন্ত্রের চোরে লব আমি প্রতিশোধি',
দর্পিত সব দস্যুর দলে অবহেলে লব বধি'।

এবে আমি মহা-নির্বাণ,
আমি চির-অবসান,

নাহি ঢেউ-গর্জ্জন,
নাহি অনন্ত ক্রন্দন,
আমি শান্ত, পূর্ণ মহান সাগর এলায়ে রয়েছি পড়ে,
অকূল-বরণ নীল আঁখি মোর নীলিমার পানে ধরে ॥

সংঘাতের গান

হাইন্‌রিখ্‌ হায়নে

আমি তরবারি, আমি উজ্জ্বল বহ্নি-শিখার রেখা।
তোমাদের আমি দেখায়েছি পথ আঁধারের মাঝে জ্বলি'।
সুরু হয় রণ, অমনি গো আমি তোমাদের দিই দেখা,
সবার আগেতে মহা উল্লাসে যুঝিবার তরে চলি।
মোর চারিধারে পড়ে আছে হের মৃত সাথী শত শত।
তবুও আমরা হোয়েছি সমর-জয়ী,
মোরা হোয়েছি বিশ্ব-জয়ী।
জয়-সঙ্গীতে বেজে ওঠে শোনো মরণের শোক-গান,
শোক, আনন্দ তরে আমাদের সময়ের অকুলান।
মাদলেতে বাজে নব সুরধ্বনি, সুরু হয় রণ নব,
আমি তরবারি যুদ্ধ-পিয়াসী, আমি শিখা অভিনব।

(জার্মাণ হোতে অনূদিত)
অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিযাত্রী

জ্যোতির্ময় রায়

অগস্ট আন্দোলনে জাতীয় প্রতিবাদ দেশের আনাচে-কানাচে অভাবনীয় উত্তেজনায় একবার জ্বলে উঠে দপ্ ক'রে নিভে গেল—এম্‌নি ক'রেই নিবলো যে তার উত্তাপের রেশটুকুও আর রইলো না। তার পর থাকলো শুধু মহাসমরের দেওয়া অসংখ্য বিড়ম্বনা—জাতীয় জীবনের শিরা-উপশিরায় যা ছড়িয়ে দিয়ে চললো অপরিসীম গ্লানি।

কলকাতায় নাগরিক জীবন অসহনীয় হয়ে উঠলো। কালোবাজারের বিষাক্ত হাওয়া, সৈন্য সংস্পর্শে আসা ভারতীয়দের উৎকট ইঙ্গয়ানা, মিলিটারির উচ্ছৃঙ্খল দাপট, পথে-ঘাটে সৈনিকদের প্রকাশ্য যৌনবিলাস, দেশের নৈতিক-জীবনকে প্রতিমুহূর্তে পায়ের তলায় পিষে চললো। তারপর যুদ্ধ একদিন থামলো। সৈন্যদল অপসারিত হতে লাগলো সহর থেকে। রেষ্টুরাণ্টের পর রেষ্টুরাণ্টের দরজা বন্ধ হলো। যারা টিকে থাকলো তারা বড় দুঃখে আবার সুরু করলো দিশি খদ্দেরদের সম্মান করতে। কালোবাজার রইলো কিন্তু তার অন্ধকারে টাকার ঝল্‌কানি এলো কমে। পতিত চরিত্র তবু সে-পথেই মাথা খুঁড়ে বেড়াতে লাগলো। নানা দিক দিয়ে নিষ্পেষিত নৈতিক জীবন তেমনি নিঃসাড় হয়েই রইলো—রাজনৈতিক জীবন স্পন্দহীন।

দেশের এই অপজাত আবহাওয়ায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মুক্তি-আন্দোলন এল ঝট্‌কা একটা ঝড়ের মতো। অনেক গ্লানি আর জড়তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক ঝাঁকুনিতে সমগ্র দেশটাকে যেন সজাগ ক'রে তুললো। জাতীয় জীবন ঘুম ভাঙা অজগরের মতো পাকের পর পাক খুলে হঠাৎ আবার ফুঁসে উঠলো মাথা উঁচিয়ে। তার যে-কোনো প্রতিবাদ মুহূর্তে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে নাগরিক নিষ্ক্রিয়তার ভিতর দিয়ে—সামান্য ইঙ্গিতে যানবাহন দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়, মিলিটারী লরির গায় আগুন ধরিয়ে ছেলের দল হাততালি দিয়ে হাসে, পাগলের মতো ঢিল হাতে রুখে দাঁড়ায় গোলাগুলির সামনে। সামান্য কারণে প্রাণ দিয়ে বসে—অমূল্য জীবনে ছেদ টানার জন্যে মহামূল্যের কোনো উপলক্ষ্য আর দরকার হয় না।

জাতীয় জীবনের এই পটভূমিকায় কলকাতা সহরে একদিন হরতাল প্রতিপালিত হচ্ছে। উপলক্ষ্য—হ্যাঁ, উপলক্ষ্য একটা ছিলো বই কি, তবে সেটা খুব উল্লেখ যোগ্য কিছু নয়। কোনো এক প্রতিষ্ঠানের ধর্ম্মঘটকারী কর্ম্মীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো—এই রকমই একটা কিছু হবে। সহরে একটা হরতাল ঘটানোর জন্যে খুব বড় একটা উপলক্ষ্য, অনেক ফতোয়া, অনেক কর্ম্মীর আপ্রাণ প্রয়াস প্রয়োজন হবে, দেশ আজ আর এতটা পিছনে পড়ে নেই।

হরতালের দিন সহরের আবহাওয়া যেমন হ'য়ে থাকে সেদিনও ছিলো তেমনি। ট্রাম, বাস, রিক্‌সা বন্ধ। বাড়ির গাড়ি যা-ও দু-দশখানা বেরিয়েছে, তাদেরও কেবলই আটক পড়তে হচ্ছে এখানে-সেখানে। পারিবারিক প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়ে তবে পথ করে নিতে হচ্ছে। অবাধ গতি একমাত্র সেই গাড়ির, যার কাচের ওপর বড়-বড় হরফে লেখা 'ডক্‌টর'। মিলিটরি লরী বিরল—যা দু'-একখানা দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে, গাড়ির নাকের ডগায় তাদের উচিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা। বিগত দু-একটি হরতালে অনেক লরি আহুতি দিয়ে রাজকীয় দম্ভ যেমনি সভয়ে গুটিয়ে গেছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এ সত্যটি উপলব্ধি করেছে, ক্রোধটা তাদের ওপর নয়, তারা আক্রান্ত হয়েছিল নেহাৎই পরিচয়ের অভাবে।

পথে লোক চলাচল কম। যুবকেরা দল বেঁধে ঘোরাফেরা করছে। ছোট-ছোট ছেলের দল মোড়ে-মোড়ে ঘুপটি মেরে বসে আছে, যানবাহন দেখলেই হৈ-হৈ ক'রে ছুটে এসে গতি রোধ করে দাঁড়ায়। এই শিশু-শক্তিকে অমান্য করবার স্পর্দ্ধা কারুর হয় না, কারণ ওরা যে তখন গণশক্তির তক্‌মা। ওদের কথার জবাব দিতে হয় সকলকেই। কেউবা তুষ্ট ক'রে ছাড়া পায়, কাউকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হয় ফিরে।

বালিগঞ্জের এক মোড়ে এমনি একদল ছেলের হাতে আটক পড়লো বিরাট একখানা গাড়ি। আনকোরা নতুন গাড়ির সাদা অলঙ্কারগুলো রোদের আলোয় ঝকমক করছে, সর্ব্বাঙ্গে ধূসর মসৃণতার আয়নাতে প্রতিবিম্বের মতোই স্বচ্ছ ফুটে উঠেছে ঘিরে-ধরা ছেলেদের মূর্ত্তিগুলি। ভিতরে নিখুঁত বিলিতি পোষাক পরা যে লোকটি স্টিয়ারিং ধ'রে বসে ছিলো, পাশের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো, 'শোনো খোকারা, রাস্তাটা একটু ছেড়ে দাও তো, বড্ড একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি—'

লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার দু' পাশে কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে। মুখে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে বটে কিন্তু মুখভাবে আর কণ্ঠস্বরে রুক্ষ স্থূল কর্তৃত্বের ভাবটা যেন পীড়াদায়ক রকমে স্পষ্ট।

তার কথায় ছেলের দল খুশি হতে পারেনি, বেশ বোঝা গেল।

'রাস্তায় আজ গাড়ি চলতে দেওয়া হবে না, আপনি জানেন না—যান, বাড়ি ফিরে যান।' একটি ছেলে আদেশের সুরে বলে উঠলো।

'আঃ—হাঁ, বাড়িই তো ফিরছি—' বেশ একটু বিরক্তির ভাব নিয়েই ভদ্রলোক বললো। কথা শেষ করতেই চোখ পড়লো বাঁ দিককার ফুটপাতে—'কে, জয়া না,' আপন মনে একবার বলে মুহূর্ত্ত সময় নিলো চিনে নিতে। তার-পর সাহেবী কেতায় শিস দেওয়ার মতো 'হুইস্' ক'রে শব্দ ছেড়ে জোর গলায় ডাকলো, 'জয়া—জয়া—'

ডাক শুনে যে-মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ালো সে একা নয়, সঙ্গে তিনটি যুবক আর বারো-তেরো বছরের গুটি দুই ছেলে। ছোট-ছেলে দুটির মাথায় গান্ধি-টুপি, মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর। বেশ একটা গুরুতর কাজে তারা বেরিয়েছে এটা আর বলে বোঝাতে হয় না।

যদিও অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই তবু ভদ্রলোক যে ভুল করেনি সেটা বোঝা গেল। মেয়েটির মুখেও দেখা দিল পরিচিতের হাসি। অস্ফুটে বললো, 'পরেশবাবু যে—' সঙ্গের যুবকদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'তোমরা এগোও সুধীর, আমি যাচ্ছি।'

ছেলেরা চলে গেল। মেয়েটি এগিয়ে এল গাড়ির দিকে।

গাড়ি ঘিরে ধরেছে যে ছেলের দল, তাদের কোলাহল কিন্তু থেমে গিয়েছিলো এ মেয়েটিকে দেখবার পরই। কারণ তাদের কাছে এ মেয়েটির পরিচয় ছাত্র-সংঙ্ঘের পরিচালিকা জয়াদি। জয়া এ পল্লীরই মেয়ে। সমাজ ও দেশ-সেবার নানা কাজের মধ্যে দিয়ে এ অঞ্চলে অনেকের কাছেই সে সুপরিচিত—বিশেষ ক'রে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। শুধুই যে পরিচিত তা নয়, সে-পরিচয়ের গুরুত্বও খানিকটা আছে, তাকে তারা সম্মান ক'রে চলে।

জয়া গাড়ির জানালার কাছে এগিয়ে এসে একটু হেসে বললো, 'কি আটক পড়লেন বুঝি! আজ আর আপনার আপিসে যাওয়া হলো না—আর আপনাদের মতো লোকদের তো না যাওয়াই উচিত; আপনাদের তো কারুর হুকুম মেনে চলতে হয় না।'

পরেশ স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে, কুশনে পিঠ ছেড়ে ঘাড় ফিরিয়ে কথা শুনছিলো জয়ার। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় কথাই শুনছে। একটু লক্ষ্য করে দেখলে কিন্তু মনে হবে শোনার চেয়ে মনযোগটা তার দেখাতেই বেশি। বেশ লাগছিল পরেশের জয়াকে। প্রায় বছর তিন পর সে দেখছে মেয়েটিকে। আগে ছিলো ভারি রোগাটে, তাই বেশ একটু যেন ঢ্যাঙ্গা আর রুক্ষই লাগতো। এখন কিন্তু লম্বায় আরো খানিকটা বেড়েছে তবু তার মনে হলো এ শরীরের জন্যে ঠিক ওটুকু প্রয়োজন ছিলো। মুখখানা ভরেপুরে বেশ একটা কমনীয় ভাব এসেছে। তীক্ষ্ণ উঁচু নাকটিও আর তেমন করে চোখে পড়ে না, সেটিও বেশ মানানসই রকমেই মানিয়ে গেছে মুখের অন্যান্য অংশের সঙ্গে। কিন্তু রংটা তেমন ফরসা নেই, কেমন যেন তামাটে ধরণের হয়ে গেছে, হয়তো রোদে খুব বেশি ঘোরাফেরা করে বলে। চোখের পরিচ্ছন্ন সতেজ সোজা দৃষ্টিটা কিন্তু পরেশের কাছে মোটেই ভালো লাগলো না। ওরকম চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার স্বাদ পাওয়া যায় না মোটেই।

পরেশ বেশ মনযোগের সঙ্গে দেখে নিলো জয়াকে। এ মনযোগটা তার পক্ষে নতুন নয়। যৌবনের সুরু থেকেই মেয়েদের সম্পর্কে সে একটু অতি মাত্রায় সচেতন। প্রৌঢ়ত্বের দিকে পা বাড়িয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় এ দুর্ব্বলতা তার কমতো কি বাড়তো বলা যায় না, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর বছর দুই যাবৎ আরো যেন স্পষ্ট আর স্থূল হয়েই দেখা দিয়েছে। জয়ার পরিচ্ছদের ওপর দিয়েও পরেশের চোখ একবার ঘুরে এলো। অতি সাধারণ একখানা শাদা শাড়ী তার পরনে। হাতে একগাছা ক'রে সরু সোনার চুড়ি। বাঁ হাতের কব্জিতে কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট্ট একটি হাতঘড়ি। সেই কাঁধেই ঝুলিয়ে দিয়েছে লম্বা স্ট্র্যাপওয়ালা একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, ঝুলটা যার কোমরের নিচে অবধি নেবে এসেছে। এ ধরণের ব্যাগ ঝুলানো মেয়ে দেখলে আজকাল তার রাগই হয়। সে দেখেছে, যে-সব মেয়েরা এটা-সেটা নিয়ে চাঁদা চাইতে আসে তাদের অনেকেরই সঙ্গে থাকে ওরকম একটা ব্যাগ। চাঁদার পরিমাণ আশাতীত বাড়িয়েও যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না। পরেশ কিন্তু নিশ্চয় করে ধরে নিয়েছে, নিজেদের দলের বাইরেই শুধু এসব মেয়েরা অমন একটা কাঠখোট্টা ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

জয়ার কথা শেষ হবার পরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরেশ তার এই বিশ্লেষণী

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জয়ার দিকে। তারপর একবার একটু নড়ে চড়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিলো সামনের ছেলের দলটি।

'হুঁ—' প'রেশ অর্থহীন একটা শব্দ করলো। জয়ার কথার জবাবে কিছু না বলে তার দিকে ঝুঁকে এসে গোপন কথার ভঙ্গীতে নিচু গলায় বললো, 'তোমার চেলাচামুণ্ডাদের একটু বুঝিয়ে বলো না গাড়িটা ছেড়ে দিতে।'

'তা ওরা ছাড়বে না।' তেমনি মৃদু হেসে জয়া উত্তর করলো।

'কেন এই তো পিছনে এক জায়গায় আটকেছিলো, বললাম ডাক্তারের বাড়ি যাচ্ছি, দিব্য ছেড়ে দিলো। এটা সেটা বলে বেরিয়ে যাওয়া যাবে একরকম ক'রে'—মুখে অত্যন্ত একটা তাচ্ছল্যের ভাব এনে বললো, 'কিন্তু মুস্কিল হলো এসব 'প্লীট আর্চিন্‌স্‌দের নিয়ে, এরা তো আর বোঝাবুঝির ধার ধারে না।'

'প্লীট আর্চিন্‌স্' কথাটা শোনা মাত্র জয়ার মুখের মৃদু হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। শান্ত মুখশ্রী তার কঠোর হয়ে এলো। ঠোঁটের কোনো স্পষ্ট একটা বিদ্রূপের ভাব নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ তা ঠিক, মিথ্যের মর্য্যাদা ওরা কি বুঝবে—একে শিশু তায় ছোটলোক।'

জবাবটা শোনা মাত্র পরেশের মুখভাবেও পরিবর্ত্তন দেখা দিলো। ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলার নৈকট্য ঘুচিয়ে মাথাটাকে একটু টেনে নিল পরেশ।

'হুঁ—তিন-চার বছরের মধ্যে তোমার অনেকটা উন্নতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।' ভারি গম্ভীর গলায় পরেশ বললো। 'মুখের ওপর পাকাপাকা কথা বলতে শিখেছ।'

পরেশের কথায় এবং বলার ভঙ্গীতে জয়া এবার রীতিমতো বিরক্ত হলো। কোনো উত্তর না দিয়ে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল যাবার জন্যে।

ছেলেদের মাঝ থেকে একজন এসে জিজ্ঞেস করলো, 'উনি বলছেন বাড়ি ফিরছেন, ওঁর বাড়ি কি এদিকে জয়াদি?' ছেলেটি আঙুল দিয়ে যে দিকের পথ রোধ ক'রে তারা দাঁড়িয়েছে সেদিকটা দেখিয়ে দিলো।

'অ—উনি বলেছেন বাড়ি ফিরছেন, তা হলে তোমরা যেমন আছ তেমনি থাকো, গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।' ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে সস্নেহ শান্ত সুরে কথা কয়টি বলে জয়া চলে গেল।

'লিসন্ জয়া—' চাপা রাগের সুরে পরেশ ডাকলো।

একটি ছেলে ডানদিকের ফুটবোর্ডে পা ছড়িয়ে মাডগার্ডে হেলান দিয়ে

বেশ আরাম ক'রে বসে ছিলো। টেনেটেনে বললো, 'অঃ একেবারে ইঙ্গলেজ—'

সে-পাশের দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে দরজা আটকালো ছেলেটির গায়।

'এই ছোকরা!' পরেশ হেঁকে উঠলো।

'ছোকরা—ছোক্‌রা কি মশাই।' লাফিয়ে উঠে ছেলেটিও রুখে দাঁড়ালো। 'মিথ্যে কথা বলে, আবার ব'লে কিনা ছোক্‌রা।'

পরেশ ততক্ষণে গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কে মিথ্যে বলেছে?' পরেশের কথায় ধমকের সুর।

'কে আবার, আপনি।' ছেলেটিও তেমনি ধম্‌কে উঠেই বললো।

পরেশের সুর কিন্তু এবার নেবে এলো নীচের পর্দ্দায়। সে দেখলো গাড়ি ছেড়ে সমস্ত দলটি এসে ঘিরে ধরেছে তাকে। হেঁ—হেঁ করে কৃত্রিম একটু হেসে বুঝিয়ে বলার ভঙ্গীতে সে সুরু করলো, 'শোনো, আগে আমার কথাটাই শোনো—'

'আর একটা মিথ্যে কথা বলবেরে, শোন্ শোন্।' গান্ধিটুপি পড়া ছোট্ট একটি মাথা বনেটের পাশ থেকে গলা উচিয়ে হেঁকে উঠলো।

এমন সময় তীব্র বেগে হাওয়া নিষ্ক্রমণের একটা শব্দ কানে আসতে পরেশের মাথা ঘুরে গেল পিছন দিকে। ছেলের দল এ কয়দিনের অভিজ্ঞতায় গাড়ি বিগড়িয়ে দেবার সব কৌশলই আয়ত্তে এনেছে। স্থূলকায় একটি ছেলে দিব্য আরামে পা ছড়িয়ে বসেছে পিছনের এক চাকারে পাশে। তার হাতে সরু একটা শলা, তাই দিয়ে চেপে ধরেছে হাওয়া দেবার মুখটা। সেখান দিয়ে সশব্দে হাওয়া বেরুচ্ছে, তারই অনুকরণে ছেলেটিও মহানন্দে মুখ উচিয়ে গাল ফুলিয়ে বুঁ-বুঁ শব্দের সঙ্গে হাওয়া বার করছে তার নিজের মুখ থেকে।

পরেশ এমনিতেই লোকটা একটু রগচটা ধরণের। হঠাৎ রাগের ঝোঁকটা সামলাতে না পেরে, 'অ-ইউ ডেভিল্' বলে এক ঝাঁকুনি মেরে এগিয়ে গেল সেই চাকার কাছে।

তারপর যা ঘটলো সে এক ভয়ানক কাণ্ড। মুহূর্ত্তে ছেলের দল গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গাড়ি আর তার মালিকের ওপর।

জয়া কিছুদূর এগিয়ে একটা গলিতে ঢোকায় গাড়িটা পড়েছে তার চোখের আড়ালে। ঝন্‌ঝন্ ক'রে কাচ ভাঙার শব্দের সঙ্গে মিলিত বালক-কণ্ঠের উল্লাস কানে আসতে একবার সে একটু থমকে দাঁড়ালো। মুহূর্ত্তে মনের

ওপর দিয়ে এ কথাটা ভেসে গেল—এর জের তাকে হয়তো বেশ ভালো হাতেই টানতে হবে। কিন্তু বেশী কিছু ভাববার মতো অবসর জয়া পেল না। খট্-খট্ হিলের আওয়াজ শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখলো ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে তারই দিকে এগিয়ে আসছে পরেশ।

পরেশের নিখুঁত কেশবেশের অবস্থা দেখে দুঃখও হয় হাসিও পায়, যেমন হয় কোনো প্রবীণ লোককে আছাড় পড়তে দেখলে। মনে হয় তার দেহের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। ছুমড়ানো-মোচড়ানো কোটটা ঝুলছে কাঁধের একপাশে, খোলা টাইটা মহাদেবের গলায় সাপের মতো একটা প্যাঁচ মেরে নেতিয়ে পড়ে আছে পিঠে, সর্ব্বাঙ্গ ধুলো-মাটিতে মাখামাখি।

পরেশের অবস্থা দেখে জয়া খুশি হয়নি, ছেলেদের এই ব্যবহারকে সে সমীচীনও বলবে না, তবু অন্যায়ের গুরুত্ব বিচারে তার মন পরেশকেই দায়ী করলো বেশী। জনসাধারণের মিলিত প্রয়াসকে আদর্শগত বৈষম্যে অস্বীকার করা যেতে পারে কিন্তু অন্যায় ঔদ্ধত্যে অসম্মান করা চলে না। করতে গেলে যে-শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয় তার পরিমাণ নিয়ে নালিশ জানানো বৃথা। অতবড় বিরাট শক্তি যখন সতেজ সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন তার মধ্যে আর যা-ই থাক না কেন, পরিমাণ বোধ থাকা সম্ভব নয়।

পরেশ নিজের অবস্থাটা এতক্ষণ শুধু অনুভবই করছিলো। জয়ার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তুলে তাকালো তার মুখের দিকে। চোখের এই চাউনি যে ঘটনার সব দায়টা তুলে দিলো জয়ার ওপর সেটা জয়া বেশ বুঝলো। পরেশের দুই চোয়ালে চাপের পরিমাণ দেখে তার ভিতর থেকে ঠেলে ওঠা ক্রোধের বেগটা জয়া অতি সহজেই আঁচ করে নিতে পারলো।

'আমাকে মিথ্যেবাদী বানিয়ে কতকগুলো স্ট্রীট আর্চিন্‌স্‌কে আমার ওপর লেলিয়ে দিয়ে এলে—' চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে টেনে টেনে পরেশ বললো।

'আপনার মিথ্যে গোপন করতে গেলে আমাকে মিথ্যে বলতে হয় সে আমি পারি না।' জয়ার কণ্ঠস্বর শান্ত স্থির।

'শোন জয়া, এই একটা দিনের উত্তেজনায় তুমি নিশ্চয়ই ভুলে গেছ তোমাদের পরিবারের কত বড় ক্ষতি আমি করতে পারি। আজকের দিনটা যে প্রতিদিন নয় আশাকরি কালকেই সেটা তুমি টের পাবে।'

গাড়ি ভাঙার শব্দ কানে আসার পর থেকে এমনি একটা

আশঙ্কা জয়ার মনেও দেখা না দিয়েছিল এমন নয়। পরেশের কথা শুনে মুখের দীপ্তি তার ম্লান হয়ে এল। অর্থহীন দৃষ্টিতে একপাশে তাকিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুহূর্ত্তের জন্যে সে চুপ ক'রে দাঁড়ালো। তারপর নীচু গলায় ধীরে ধীরে বললো, 'অ—এর শাস্তি আপনি চাপাবেন আমার বুড়ো বাবার ওপর—এই তো! কারণ নিরীহ ঐ লোকটি আপনার মুঠোর মধ্যে—'

বলতে বলতে এর চরম ফলাফলের কথাটাও সে একবার ভেবে নিলো। কিন্তু স্বার্থের মুখ চেয়ে অন্যায়কে মেনে নেবার চরিত্র জয়ার নয়।

'শুনুন পরেশবাবু!' দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘাড় ফিরিয়ে সোজা সে তাকালো পরেশের চোখের দিকে। 'যে ক্ষমতার আপনি এতখানি বড়াই করছেন, তা নিয়ে যে গুটিকয় বাচ্ছা ছেলের সামনে দাঁড়াবার সাহসও আপনার নেই সে তো দেখতেই পেলাম—' জয়ার কণ্ঠ কঠোর। 'এখন পারেন তো সেটা খাটান আমার ওপর, বুড়ো নিরপরাধ এক কর্ম্মচারীকে লাঞ্ছিত করায় কোনো কৃতিত্ব নেই।'

'হুঁ—' চরম স্পর্দ্ধায় অবাক হয়েই শব্দটা পরেশ করলো, যেন বললো, অ—এতদূর। 'দরকার মনে করলে তুমিও বাদ পড়বে না—ইউ ইউ—' উদ্গত একটা রূঢ় সম্বোধন পরেশের জিভের ডগায় এসে আটকে গেল।

'বলুন—বলুন—' অর্থাৎ পরেশের মতো লোকের মুখেও কিছু আটকাতে দেখে সে যেন অবাক হচ্ছে এমন ভাব নিয়েই জয়া বললো।

পরেশের কিন্তু বলা হলো না। তার কারণ কি তার শেষ ভব্যতা জ্ঞান না অদূরে আগত জয়ার সঙ্গীদেরই একটি যুবকের মূর্ত্তি সেটা বলা কঠিন। তবে কিনা যুবকটিকে দেখবার পর তার কথা যে শুধু অসমাপ্ত রইলো তা নয়, ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে সে স্থানই সে ত্যাগ করলো।

যুবকটির নাম সুধীর। সুধীর জয়ার কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'ঐ লোকটা তোমার ওপর খুব চোখ রাঙাচ্ছিলো মনে হলো?'

'হুঁ, খুব শাসিয়ে গেল।' পরেশের চলে যাওয়ার দিকে চোখ রেখে একটু দুঃখের সুরেই জয়া বললো।

'দাঁড়াও, ঘুষি মেরে ওর নাক আমি—' কথা সুধীর শেষ করে না। তার কৃশ দেহের সরু কব্জি থেকে আস্তিনটাকে সে হিঁচকে টানে তুলে নেয় কনুইএর ওপরে। তারপর হয়তোবা আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই পা বাড়ায়।

জয়া সুধীরের হাতটা ধরে ফেলে। 'থাক আর ঘুষি মারতে হবে না, চলো।'

কয়েক পা এগিয়ে গেল দুজনে। সুধীর ছেলেটি খুব কাজের হলেও একটু ভীতু প্রকৃতির জয়া জানে। তাই হেসে বললো, 'ধ'রে ফেলার লোক কাছে থাকলে ঘুষি বাগিয়ে রুখে ওঠা কতখানি নিরাপদ তা' তুমি জান দেখছি।'

'অ—তুমি বুঝি তাই ভাবলে—'সুধীর আবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

'থাক, আর প্রমাণ করতে হবে না, চলো সভার অনেক সব কাজ বাকি রয়েছে।'

দু'জনে এগিয়ে চললো শ্লথ পদক্ষেপে। সুধীর গড়গড় করে অনেক কথা বলে গেল। তার বক্তব্য, শারীরিক শক্তিটা কিছু নয়, মনের জোর থাকলে কি না করা যায়। প্রথমটা তার নেই বটে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সে কতটা সমৃদ্ধ ঘটনার নজির টেনে তা প্রমাণ করতেও বাকি রাখলো না। জয়ার কিন্তু এসব কথায় কান ছিলো না। সে একটু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছে। পরেশবাবুর এ ক্রোধ কোথায় গিয়ে কি ভাবে কার্য্যকরী হবে ভাবতে গিয়ে মন তার ক্রমেই ভয়ে ভাবনায় মুষড়ে পড়তে লাগলো। সঞ্চয়হীন মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র অবলম্বন চাকরি, তারই ওপর পড়বে গিয়ে এর চরম আঘাত, যে চাকরির বোঝা তার বুড়ো বাপ বাধ্য হয়েই দিনের পর দিন টেনে চলেছেন। আজও তাঁকে আপিসে যেতে হবে। পরেশবাবুর মতো লোক যে-আপিসের কর্ত্তা আজকের দিনে কামাই করা যে সেখানে সব চাইতে বড় অপরাধ। হেঁটে গড়িয়ে যেমন ক'রে পার আপিসে হাজির হতে হবে, এই নাকি কর্তৃপক্ষের হুকুম—বাবার মুখ থেকেই একথা সে শুনেছে। গ্রীষ্মের রোদে-পোড়া যানবাহন হীন পথে বৃদ্ধ পিতার ক্লান্ত পদক্ষেপ জয়ার চোখের সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো। মনটা তার বিষণ্ণতায় ভরে গেল।

সুধীর এর মধ্যে আরো অনেক কথা বলেছে, জয়ার কানে সেগুলো নেহাৎই অর্থহীন শব্দের মতো বেজে গেছে।

'আচ্ছা জয়াদি, তুমিতো লোকটাকে চেন?'

প্রশ্ন ক'রে বসায় কথাটা শুনে জবাব দিতে হলো জয়ার।

'হু" জয়া বললো।

'কেমন লোক বলতো, এমন দিনে কিনা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে বড়লোকী ফলাতে।'

'এ বড়লোক গরীবলোকের কথা নয় সুধীর, এ হলো চরিত্র—' দুঃখের সুরে অনেকটা অপন মনে বলার মতো করেই জয়া বললো, 'এ জাতের একদল লোকের ওপর ভিত করেই তো দেশের দুর্ভাগ্য দাঁড়িয়ে আছে।'

জয়া হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললো, 'একটু পা চালিয়ে চলো সুধীর, আমি এগারোটার মধ্যে সঙ্ঘের সবাইকে পার্কে গিয়ে জড়ো হতে বলেছি।'

জয়ার বাবা মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ভালো লোক। এমন কি একটু ভীতু প্রকৃতিরও বলা যেতে পারে। পারতপক্ষে কোনো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চান না। কিন্তু এমনি তাঁর ভাগ্য যে নানা ভয়প্রদ ঝঞ্ঝাটই এসে পড়ে তাঁর ঘাড়ে। সব চেয়ে বড় বিড়ম্বনা পোয়াতে হয়েছে বড়ছেলে অমিয়কে নিয়ে। দশবছর আগেকার সেই রাতটি স্মরণ করতে আজও তাঁর বুক কেমন করে ওঠে। কেবল মাত্র মহেন্দ্র বাবুর স্মরণীয় ঘটনা হিসেবেই যে সেই রাতটি উল্লেখযোগ্য তা নয়, তার ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকুর আরও বড় তাৎপর্য্য হলো, এ-পরিবারের গতি-পরিণতির একটা বিশেষ পরিচয় তাতে আছে।

রাত তখন বারোটা হবে, আচমকা অসভ্য রকমের কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে মহেন্দ্রবাবু চমকে উঠে বসলেন। স্ত্রী সরোজিনী কিছুক্ষণ আগে সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে শুয়েছেন, ঘুম তখনও তাঁর আসেনি, স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে ব'সে শঙ্কিত সুরে বললেন, 'তুমি কেন উঠছো, ছেলেদের কাউকে ডাক।'

কাঁচাঘুম ভেঙে জয়াও উঠে পড়েছে। জয়ার বয়স তখন বছর বারো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো, 'কে মা, কি হয়েছে মা।'

'অমিয়—শিবপদ—' মহেন্দ্রবাবু গলা ছেড়ে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে কড়াটা তীব্রভাবে আর একবার শব্দ ক'রে উঠলো।

শিবপদ মহেন্দ্রবাবুর শ্যালক। পোস্ট অফিসে কাজ করে। সন্তান-সম্ভবা স্ত্রী বাপের বাড়ি যাবার পর কিছুদিনের জন্যে বাসা ছেড়ে দিয়ে দিদির বাড়ি এসে উঠেছে। ভাগ্নেদের ঘরের একপাশে একটা তক্তপোষে তার বিছানা। সে যে ঘুমিয়ে আছে তা নয়। কড়া নাড়ার শব্দ, ভগ্নীপতির ডাক দুইই সে শুনেছে। কিন্তু শুনলে হবে কি, নড়বার বা কথা বলবার মতো শক্তি থাকলে তো। ভয়ে যে তার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে।

রাস্তার পাশেই ঘর। ঘরে বাতি জ্বলছে। অমিয় টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখেছিলো, অন্যপাশে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত ছোট ভাই সুশান্ত। কড়া নাড়ার রকম দেখেই অমিয় টক্ করে বাতিটা নিভিয়ে দিয়েছে। কিসের একটা শঙ্কা যেন সজাগ হয়েই ছিলো তার মনে!

'কে, কি হলো, বাতি নেবাচ্ছিস কেন?' শিবপদ বিছানায় উঠে বসেছে।

'চুপ করুন, চেঁচাবেন না।' গলা চেপে অমিয় বললো। বলেই এগিয়ে গেল রাস্তার পাশের জানালার কাছে। একপাশ থেকে একবার উকি দিয়েই আস্তে জানালাটা ভেজিয়ে দিয়ে ছিটকিনিটা সে চেপে দিলো।

ফিরে এসে বাতি জ্বালতেই দেখতে পেল শিবপদ তার বিছানায় দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে বসে আছে ঠিক ওত পেতে বসার ভঙ্গীতে, চোখে তার ভীত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

অমিয় কাছে এসে বললো, 'পুলিস—'

শিবপদ ভঙ্গী বদলালো না, শুধু মুখ উঁচিয়ে তাকানো মাথাটা যেন মহা-সর্ব্বনাশের ভারে ঝুলে পড়লো দু'হাতের মাঝখানে। নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়ে প্রথমেই মনে হলো তার, কেন সে মরতে এসেছিলে এ বাড়িতে।

এ জন্যে শিবপদকে অবশ্যি দোষ দেওয়া চলে না। সেদিনে পুলিশ শব্দটা নেহাৎ একটা শব্দই ছিলো না, মধ্যবিত্তের ঘরে-ঘরে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো একটা আতঙ্কের বস্তু।

বাবার ডাক শুনে অমিয় বললো, 'যান মামা, বাবা ডাকছেন'—বেশ একটু আদেশের সুরেই বললো, 'উঠুন—' শিবপদকে এক্ষুনি কিছু সময়ের জন্যে এ ঘর থেকে সরানো তার দরকার।

যে-ছেলের জন্যে পুলিশ এসে বাড়ি চড়াও করে তার আদেশ অমান্য করতে পারে এমন সাহসও আবার শিবপদের নেই। তাই মামা হয়েও ভাগ্নের কথায় বাধ্য বালকের মতো উঠে দাঁড়ালো। কম্পিত পদক্ষেপে সে গিয়ে যখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছে মহেন্দ্রবাবু তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন সদর খুলতে যাবেন বলে।

'ডাকছি শুনতে পাওনা—' মহেন্দ্রবাবুর সুরে বিরক্তি।

'পু—লি—শ—' ভয়বিহ্বল দৃষ্টি মেলে শুধু একটি কথাই শিবপদ বলতে পারলো।

কথাটা শুনে মহেন্দ্রবাবু ও মুহূর্ত্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

এদিকে তখন অমিয় ত্রস্ত মা'র কাছে এসে একটা নোটবই আর কাগজে মোড়া ছোট একটা ভারি জিনিস নিজের হাতেই গলিয়ে দিলো মা'র সেমিজের মধ্যে।

"আমাকে যদি ধরে নিয়ে যায় কেউ-না-কেউ আসবে তোমার কাছে—প্রণাম করে যদি বলে 'মা আপনার কাছ থেকে আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি,' তাকে এগুলো দিয়ে দিও—'এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টা বলে অমিয় আবার ফিরে গেল তার ঘরে।

বস্তুগুলোর তলায় সরোজনীর বুক তখন কি ভাবে স্পন্দিত হচ্ছিলো সেটা তিনিই জানেন। দেহটাকে খাড়া রাখবার উদ্দেশ্যে খাটের কোণটা তিনি সজোরে চেপে ধরলেন। তাঁর চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। অমিয়কে জড়িয়ে ধরবার জন্য মনটা ছুটে গেল তার পেছনে—ঐ বস্তুগুলোর মতো অমিয়কেও যদি তিনি বুকের কোথাও অমনি ক'রে লুকিয়ে ফেলতে পারতেন! তবে যেন ভয় ভাবনার কিছু থাকতো না।

সাধারণতঃ পুলিশ বাড়ী খানাতল্লাশ করতে এসে বাড়ি ঘেরাও করে শেষ রাতে, কাজ আরম্ভ করে ভোরের আলোয়। অসময়ে এসে হানা দেবার কারণটা মহেন্দ্রবাবু দরজা খুলেই জানতে পেলেন। বাঙালী পুলিশ ইনস্‌পেক্টর এগিয়ে এসে দ্রুত বলে গেল, 'সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট' নেই, এমন জরুরী অবস্থায় ডেপুটি কমিশনারের হুকুমই যথেষ্ট।' বলে পাশ ফিরে তাকানোর ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো সেই শেতাঙ্গ কর্ত্তৃত্বের সশরীরে উপস্থিতি। হয়তোবা জরুরীত্বের কারণ বোঝাতে স্বল্প কথায় এ আভাসও মহেন্দ্রবাবুকে দিলো যে তাঁর ছেলে অমিয়ের সঙ্গে ভয়ানক কোনো এক ঘটনার যোগসূত্র পাওয়া গেছে।

পাড়ার দুই ভদ্রলোককে সাক্ষী হিসেবে তারা সঙ্গে করেই এনেছে। মহেন্দ্রবাবুকে বলা হলো যেসব পুলিশ কর্ম্মচারী ভেতরে ঢুকবে তাদের দেহ খানাতল্লাশ করে দেবার জন্যে। ভীত বিমূঢ় মহেন্দ্রবাবু সবিনয়ে জানালেন তার কোনো প্রয়োজন নেই। কমিশনার সাহেব ভব্যতা বহির্ভূত ধমকের সুরে বলে উঠলো, যা বলা হচ্ছে তা মানতে। অন্যায়, অত্যাচার যাই ইংরেজ করুক, করে রীতিপদ্ধতির ভিতর দিয়ে, তার ব্যতিক্রম তারা সইতে পারে না।

মহেন্দ্রবাবু রীতিরক্ষার মতো করে তাদের স্পর্দ্ধিত পোষাকের এখানে সেখানে একটু হাত বুলিয়ে নেবার পর তারা ভিতরে ঢুকলো। প্রথমেই গ্রেপ্তার

করা হলো অমিয়কে। তারপর সুরু হলো একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার, বাক্স, বিছানা, টেবিল, আলমারী উন্মাদের মতো তচ্‌নচ্‌ করে তারা ঘরময় ছড়িয়ে ফেলতে লাগলো। অমিয় একপাশে বসে আছে পাথরের মূর্ত্তির মতো। ভয়ের লেশ মাত্র তার মুখে নেই। একটু দূরে সুশান্ত সঙ্কুচিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে। ছোট্ট মেয়ে জয়ার মুখের ভাবটি কিন্তু লক্ষ্য করবার মতো। ভয় তা দূরের কথা তার চোখে মুখে ফুটে আছে একটা চাপা তিরস্কার। ঘাড় বাঁকিয়ে এমন অবাক ভাব নিয়ে মাঝে-মাঝে সে তাকাচ্ছে বাবা আর দাদার দিকে, যেন বলতে চাচ্ছে, একি কাণ্ড, এরা এত সব অন্যায় করছে, তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন! সরোজিনীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পাশের ঘরে। সে ঘরটা পরে দেখা হবে। মহেন্দ্রবাবুর দাঁড়িয়ে থাকবার মতো ক্ষমতা নেই, তিনি বসে আছেন একটা চেয়ারে। বিস্ফারিত অর্থহীন চোখে তাকিয়ে আছেন অমিয়র দিকে। অসহায় বোধে ভিতরটা যেন তাঁর ভেঙে পড়ছিলো, কেবলই মনে হচ্ছিলো, পরিবারকে এত বড় বিপদের মধ্যে যে ঠেলে দিতে পারে সে ছেলে নয়, শত্রু।

এর মধ্যে শিবপদ যে কাণ্ড করে বসলো তা একমাত্র তার মতো লোকের দ্বারাই সম্ভব। বগলে বিছানা, হাতে স্যুটকেস নিয়ে সে এসে ঘরে ঢুকলো। এগিয়ে গিয়ে সে ছুটো নাবিয়ে রাখলো সাহেবের সামনে। পা ছুটো তার ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। 'ছু-হাঁটুতে করতাল বাজা' কথাটার উদ্ভবের মূল খুঁজে পাওয়া যায় তাতে। ভাঙা, ভুল ইংরেজিতে সাহেবকে এটাই শিবপদ বুঝিয়ে দিলো, সে গবরমেণ্টের ভৃত্য, কপাল দোষে এবাড়িতে এসে পড়েছে দিনকয়েক আগে, তার বিছানা আর স্যুটকেসটা কৃপা করে কেউ একটু দেখে দিলে এই মুহূর্ত্তেই এ বাড়ি সে পরিত্যাগ করতে পারে।

কমিশনার সাহেব ধমকে উঠলেন বটে কিন্তু ধমকটা তেমন যেন জোরালো মনে হলো না—হয়তো ভেতরে চাপা হাসি ছিলো বলে।

শিবপদর কাণ্ড দেখে মহেন্দ্রবাবুর মনটা যেন একটু হালকা হলো। মনুষ্যত্বের এই বিকৃত রূপের পটভূমিতে নিজের ছেলেকে তিনি নতুন করে চিনলেন। এতক্ষণকার ভয়-ভাবনা অসম্মানবোধ, অমিয়র প্রতি বিরক্তি, সব কিছুর ভিতর দিয়ে ক্ষীণ একটা আত্মপ্লাঘার ভাবও জেগে উঠলো তাঁর মনে।

এদিককার বস্তু এবং ব্যক্তির ওপর ঘণ্টা তিন তল্লাশী-ঝড় চালিয়ে ইন্‌সপেক্‌টর সামান্য একটু বিনয়ের ভান নিয়ে খোঁজ করলেন অমিয়র মা'র—

তাঁকেও নাকি বাদ দেওয়া চলবে না; তাঁর দেহ-তল্লাশেরও ব্যবস্থা একটা করা দরকার।

কথাটা শোনা মাত্র অমিয়র ভেতরটা এবার সত্যি সত্যিই কেঁপে উঠলো। এ সে কি ক'রে বসে আছে। মাকে তার নিজের লাঞ্ছনার সঙ্গে এনে জড়ানোর কি প্রয়োজন ছিলো—না হয় যেত একটা যন্ত্র হাত ছাড়া হয়ে। একটু পরেই তো মার কাছ থেকে ওগুলো বেরিয়ে পড়বে—তারপর—কোনো অছিলায় একবার যদি এখন সে মা'র কাছে যেতে পারতো! অপরিসীম অস্থিরতায় সে নড়ে চড়ে ওঠে, পর মুহূর্ত্তে মনের সব আলোড়ন সজোরে চেপে শক্ত হয়ে বসলো অমিয়—যে-কোনো অভিব্যক্তি যে আরো সন্দেহের কারণ হবে।

ইতিমধ্যে হাবিলদার গিয়ে পাকড়াও করে এনেছে এক বিহারী গোয়ালার স্ত্রীকে। এ পাড়াতেই একটা ডেরায় তারা থাকে। ইন্‌স্‌পেকটরের কাছ থেকে কর্ত্তব্য বুঝে নিয়ে স্ত্রীলোকটি ঢুকলো সরোজিনীর ঘরে।

'ইয়ে কেয়া মাইজী!' সরোজিনী বুকে হাত পড়তেই আঁৎকে উঠে স্ত্রীলোকটি বললো।

কিছু বলবার মতো অবস্থা সরোজিনীর ছিলো না। স্ত্রীলোকটির হাতটা সজোরে তিনি চেপে ধরলেন। তারই ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল তাঁর অন্তরের অনুনয়।

সরোজনীর সেমিজটা ঘামে ভিজে গেছে, তার তলায় হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফাচ্ছে উন্মত্তের মতো। প্রতিটি ধাক্কা তার বিহারী স্ত্রীলোকটি অনুভব করতে থাকে তার হাতে। কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে-ধীরে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সব ক'জোড়া পুলিশ-চোখ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অমিয়র চোখে চেঁচানো অনুনয়। স্ত্রীলোকটি তার দিকে চাইলেই যেন পৌঁছে দিতে পারে তার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

স্ত্রীলোকটি কিন্তু কারুর দিকে বিশেষ ক'রে তাকালো না।

'নেহি সাব, কুছ তো নেহি মিলা।' কথা কয়টি বলে নম্রভাবে সে মাথা নাবালো।

সাহেব ধমকের সুরে বলে উঠলো, 'ঠিক্‌সে তাল্লাস কিয়া—ইধার-উধার সব—?' নিজের গায়ে হাত রেখে ছু-একটা বিশেষ স্থান সে দেখিয়ে দিলো।

এক মুহূর্ত্ত, তারপরই স্ত্রীলোকটির সরু লম্বা শরীরটা যেন ছোট একটা

ঝাঁকি মেরে সোজা হয়ে ওঠে। কালো মুখের ছোট-ছোট চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করে তাকায় সোজা সাহেবের চোখের দিকে।

'নেহি সাহাব, বিলকুল কুছ নেহি, মাঁয়নে বহুৎ আচ্ছিসে দেখি।'

বিশেষ জোর দিয়ে-দিয়ে প্রতিটি কথা সে বললো। এমন সব লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো সত্য কথাও এতখানি জোরের সঙ্গে সে বলতে পারতো কিনা বলা যায় না। সে-ঘরের মধ্যে একমাত্র অমিয়ই দেখতে পেল স্ত্রীলোকটির গ্রীবাভঙ্গিতে ঝল্‌কে উঠছে গর্ব্ব আর আনন্দ।

তারপরের ঘটনাটুকু সংক্ষিপ্ত। সরোজিনীকে সরিয়ে সে-ঘরটা দেখা শেষ করে অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে তারা রওনা হলো। যাবার মুখে ডেপুটি-কমিশনার জয়ার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে আপন মনেই বললো, 'Hum, here is another dangerous element yet to be grown—'

পুলিশ চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যে শিবপদও সরে পড়লো তার বাক্স-বিছানা নিয়ে। তছনছ করা আসবাবপত্রের মধ্যে পড়ে রইলো চারটি মূর্ত্তি—সরোজিনী একপাশে উবু হয়ে কাঁদছেন, মহেন্দ্রবাবু তাঁর চেয়ারটিতে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে আছেন, ভালমন্দ কোনো কিছু ভাববার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। জয়া তার ছোড়দা' সুশান্তের পাশে চুপটি করে বসে আছে কোলের ওপর হাত দু'খানা রেখে।

সে রাতের পর দিনও অনেকগুলো কাটলো—কিন্তু কাটলো আরো নানা ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়ে। বিলিতি সওদাগরী আপিস থেকে মহেন্দ্রবাবুর চাকরিটি গেল। কেন গেল তার কারণ কর্ত্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে কিছু জানতে দেয়নি। এই ভেবেই হয়তোবা তারা মহেন্দ্রবাবুকে সরিয়েছে, ছেলে যার অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমনভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে তার নিজের মধ্যেও মনুষ্যত্বের বীজ কোথাও-না-কোথাও লুকানো আছে। দুর্দ্দিনে আত্মীয়-স্বজন যে কর্ত্তব্যটা মুক্তমুখে করে থাকে, সেই সহানুভূতি বস্তুটিও মহেন্দ্রবাবু বা সরোজিনীর ভাগ্যে ঘটলো না। কারণ মরার বাড়া এই বিপদ—প্রকাশ্যে আত্মীয়তা স্বীকার নিরাপদ বলে তারা মনে করতে পারে নি। আর্থিক ও মানসিক এই বিড়ম্বনার সঙ্গে চললো অমিয়র বিচারের প্রহসন। অপরাধ প্রমাণিত হলো না কিন্তু সে বন্দী হলো অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে। মহেন্দ্রবাবু ভেঙে পড়লেন। এমন সময় সত্যিকারের সহায় রূপে তাঁর পাশে এসে

দাঁড়ালো দেবেশ। দেবেশ মহেন্দ্রবাবুর বাল্যবন্ধু বিজয় মুখার্জ্জির পুত্র। বিরাট শিল্পপতি বিজয় মুখার্জ্জির ধনাধিক্যে সে পরিচয় আজ শুধু সুদূর নয়—অর্থহীন। তাই এ পরিবারে আজ দেবেশের সত্যিকারের পরিচয় হলো, অমিয়র সে সহপাঠী বন্ধু। যদিও পিতৃ-পরিচয়ের সূত্র ধরে মহেন্দ্রবাবুকে সে কাকা বলেই ডাকে।

দেবেশের আন্তরিক চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত বাল্যবন্ধুর আপিসে একটি আসন জুটলো মহেন্দ্রবাবুর ভাগ্যে। তারই ওপর নির্ভর করে আজ অবধি পরিবার তাঁর চলছে।

বছরের পর বছর কাটলো, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত গতিতে বদলালো দেশের রাজনৈতিক জীবন। যে মহান প্রয়াস একদিন প্রকাশ পেয়েছিলো দু-চার জনকে অবলম্বন করে, দেশের ভিতর দিয়ে ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ছে শত-সহস্রের জীবনে—এ সত্য অমিয় জেলে যাবার পর বছর কয়েকের মধ্যে মহেন্দ্রবাবু বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করেছেন। যে অমিয়র জন্যে একদিন সবাই সরে দাঁড়িয়েছিলো, সেই অমিয়র বাবা বলে এখন তিনি সকলের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে থাকেন। তারপর দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে পাওনা তাঁর আরো বেড়েছে। জয়াও তার জীবনকে গড়ে তুলেছে দাদার আদর্শে। দেশের নানা কাজের মধ্য দিয়ে সে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছে। সে সুনাম অধুনা আরো উজ্জ্বল হয়েছে তার বি-এ পরীক্ষার বিশিষ্ট সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। সহকর্ম্মীদের মুখে ছেলেমেয়ের এই প্রশংসা শুনে বেশ একটা ভরাট মন নিয়েই আপিস থেকে তিনি বাড়ি ফেরেন। অবশ্যি সুশান্তকে তেমন তিনি বুঝতে পারেন না। কেমন আবছা ধরণের তার চালচলন। আজ চার বছর হতে চললো এম-এ পাশ করে বসে আছে। যতক্ষণ বাড়ি থাকে ততক্ষণ একটা না একটা বই নিয়ে চিৎ হয়ে থাকতে দেখা যায়। এর বাইরে কি সে করে বা মোটেই কিছু করে কিনা মহেন্দ্রবাবু জানেন না। সাংসারিক বিষয়ে এ ছেলের কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য তিনি আশা করেছিলেন। তা পেলেন না বলে বেশ একটু বিরক্তও সুশান্তর ওপর। তবু মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হয় সুশান্তর এই দায়িত্বজ্ঞানের অভাব তিনি অনায়াসেই ক্ষমা করতে পারতেন, যদি দেখতেন সে অমিয় বা জয়ার মতোই কোনো এক মহান কর্ত্তব্য নিয়ে মেতে আছে।

মহেন্দ্রবাবু নিজে কখনো কোনো রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেননি। এক সময় ছিলো যখন ওসব থেকে অনেক দূরে থাকাই তিনি শ্রেয় মনে করতেন। পরে বিরূপ ভাবটা কাটলো বটে তবে তেমন যে একটা উৎসাহ বোধ করতেন তা-ও নয়। কিন্তু কিছুদিন হলো তাঁর মনে একটা ভাব খুব তীব্র হয়ে উঠেছে। উপস্থিত দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট না থেকেও তার সঙ্গে কেমন একটা ঘরোয়া সম্পর্ক তিনি মনে-প্রাণে অনুভব করেন। জাতীয়জীবনে সে-তরঙ্গ যখন অত্যধিক উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তখন সাময়িক আবেগ এবং উত্তেজনায় একটু যে চঞ্চল না হন এমনও নয়।

কথায়-কথায় হরতাল তো আজকাল লেগেই আছে। যেদিন যাত্রীবাহী যানবাহনও সে-সঙ্গে যোগ দেয় সেদিন সহরের আবহাওয়ায় সমবেত প্রয়াসের রূপটা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই আজ আপিসে যাবার জন্যে পথে নেবে মহেন্দ্রবাবু অন্যায় বোধে নিজের কাছেই নিজে যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ বয়সে রোদ্দুর মাথায় নিয়ে দীর্ঘ তিন মাইল পথ অতিক্রম করার যে শারীরিক কষ্ট তার কথা ভেবেই তখনকার জন্যে মন বেশী বিমুখ হবার কথা। কিন্তু শ্রেয় বলে ভাবতে পারলে মহেন্দ্রবাবু যেন শারীরিক এ ক্লেশকে আমলেই আনতেন না। তাঁর অস্বস্তি বোধটা হলো আত্মাবমাননার। ফুটপাথ ধরে চলতে-চলতে কেবলই মনে হতে লাগলো, ছেলে যার দশ বছর হতে চললো জেলে পচে মরছে, মেয়েটা হয়তো এখন রোদ্দুর মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই হরতালকেই পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে, তাদেরই বাপ হয়ে কিনা তিনি চলেচেন তিন মাইল পথ হেঁটে আপিসে হাজিরা দিতে। সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্যি নিজের মনকে আবার বুঝিয়েও চলেন। হাজিরা না দিলে তো চাকরী থাকবে না। পারিবারিক কর্ত্তব্যও যে এক বিরাট কর্ত্তব্য। তিনি তা আজ অবধি ব'য়ে চলেছেন বলেই না ছেলে মেয়েরা নিশ্চিন্তে কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছে।

ক্লান্তির ভারে চিন্তা ক্রমে আবছা হয়ে আসে। শেষের পথটুকু যেন অসম্ভবই মনে হয়। তখন সব চিন্তা মুছে গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনাহীনতার বিরুদ্ধে মহেন্দ্রবাবুর মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। চাকরী যারা করতে আসে তাদের কি দুঃখ-কষ্ট বলে কোনো বস্তু নেই নাকি! আসা যাওয়ার যানবাহনের বন্দোবস্ত না করতে পারলে আপিস সেদিন বন্ধ রাখাই উচিত। ট্রাকের ব্যবস্থা করে রাখা দরকার এমন একটা কথা আপিসে উঠেছে। হতে-হতে কতদিন গড়িয়ে যাবে বলা কঠিন।

মহেন্দ্রবাবু আপিসে ঢুকতেই শিখ দরোয়ান তার টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানালো।

'বড্ডাবাবু আজ আপ কেইসে আয়া?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো দরোয়ান।

ঝুঁকেপড়া ক্লান্ত দেহটা সোজা করে পরিহাস মেশানো একটা গর্ব্বের ভাব নিয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'কি'উ, পয়দল।'

জিবে খেদ সূচক শব্দ করে বারকয়েক দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লো দরোয়ান।

দোতলা আর তেতলার প্রকাণ্ড দুটো হলঘরে 'মুকার্জি' কোম্পানির আপিস। হলের দু'পাশে টেবিল বিছানো। প্রত্যেক টেবিলে দু'জন ক'রে কেরানী বসে কাজ করে। এরই মধ্যে ডিপার্টমেণ্ট ভাগ করা আছে। মহেন্দ্রবাবু এই আপিসের এ্যাকাউন্টেণ্ট। তাঁকে বসতে হয় তেতলায়। সেখানকার ব্যবস্থাও দোতলারই অনুরূপ। তফাতের মধ্যে একটু বেশী সাজানো গুছোনো আর পরিচ্ছন্ন। কারণ হলের শেষ মাথায় জেনারেল ম্যানেজর পরেশ মুখার্জির কামরা। হিল ঠুকে এই হলের মধ্যপথ দিয়ে তিনি যখন যাওয়া আসা করেন তখন পদক্ষিপ্ত কম্পিত মেঝের মতোই কেঁপে ওঠে দু'পাশের কেরানীদের বুক।

মহেন্দ্রবাবু যখন হলে ঢুকলেন তাঁর অবস্থা দেখে সহকর্ম্মীদের অনেকেই মৃদু তিরস্কার করলো, বুড়ো বয়সে এভাবে হেঁটে আপিসে আসার জন্যে। রণেন মহেন্দ্রবাবুর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট। বছর তিরিশ বয়েস। দীর্ঘ সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবক। পোষাকের মধ্যে লক্ষণীয় হলো সার্ট ছাড়া আর কিছু পরতে দেখা যায় না। এবং সেই সার্টের হাতা দুটো সব সময়েই ভাঁজ করে গুটোনো থাকে কনুইএর ওপর অবধি। অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার। কিন্তু অমায়িকত্বের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাটুকু খুবই স্পষ্ট। ছেলেটিকে খুবই পছন্দ করেন মহেন্দ্রবাবু। রণেনেরও শ্রদ্ধা এবং ভালবাসাটা তাঁর প্রতি আন্তরিক।

মহেন্দ্রবাবুকে দেখা মাত্র রণেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'আপনি আজ না এলেই পারতেন।' বলে রণেন মহেন্দ্রবাবুর চেয়ারটা টেবিল থেকে একটু পেছনে টেনে ঢোকার সুবিধে করে দেয়।

'চলে এলাম একটু কষ্ট করে, কাজেকর্ম্মে তোমাদের মধ্যে সময়টা কাটে ভালো।'

না আসাটা যে এত সহজ নয় উভয় পক্ষই তা বিলক্ষণ জানে। জানা

সত্ত্বেও প্রশ্নোত্তরে সেদিকটা তারা এড়িয়ে যায়। সেসব কথা উঠে পড়লে সহজ সুরে মানুষের মতো অনেক কথাই বলা চলে না।

মহেন্দ্রবাবু চেয়ারে বসে একটু হাঁপ ছাড়ারও অবসর পেলেন না। বেয়ারা ছুটে এসে খবর দিলো, সাহেব ফোনে ডাকছেন—জল্‌দি। আপিসে সাহেব বলা হয় পরেশ মুখার্জিকে।

হলের এক কোনে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা ছোট একটি কামরায় বসে বড়বাবু। তারই টেবিলে ফোন। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে মহেন্দ্রবাবু গিয়ে ফোন ধরে দাঁড়ালেন।

'হ্যালো—'

'কে, এ্যাকাউন্‌টেন্ট ?' রূঢ় কণ্ঠে উল্টোদিক থেকে প্রশ্ন করলো পরেশ।

'হ্যাঁ, এ্যাকাউন্‌টেন্ট—' মহেন্দ্রবাবু বললেন।

'শুনুন, আপনাকে এক্ষুণি একবার আসতে হবে আমার বাড়ি। জরুরী দরকার।'

'তা বাবা এক্ষুণি না এলে কি নয়!' ভীত কণ্ঠে অনুনয়ের সুরটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। 'এমনিতেই তিন মাইল হেঁটে আপিসে এসেছি, বুড়োমানুষ—এখনি কি আবার এতটা পথ হাঁটতে পারবো!'

'তার আমি কি জানি। ট্রাম-বাস তো আর আমি বন্ধ করিনি।' পরেশ যেন মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। 'আপনার মেয়ের যখন এ ব্যাপারে এত উৎসাহ তখন আপনাকে তার খানিকটা ফলভোগ করতে হবে বৈকি।'

'আমার মেয়ে—কে, জয়া! সে আবার কি করেছে?—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আচ্ছা, আচ্ছা বাবা গিয়েই সব শুনবো।'

কম্পিত হস্তে ফোনটি নাবিয়ে রেখে মহেন্দ্রবাবু বেরিয়ে এলেন। অজানিত আশঙ্কায় দেহ মন আরো যেন অবসন্ন হয়ে এলো তাঁর। নিজের জায়গায় ফিরে চেয়ারের পিছন থেকে চাদরটি তুলে কাঁধে ফেললেন। তারপর রণেনের সঙ্গে পর্য্যন্ত একটি কথা না বলে ধীরে ধীরে আপিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অসময়ে মহেন্দ্রবাবুর এই নীরব নিষ্ক্রমণের হেতুটা বড়বাবুর কামরা থেকে আপিসময় ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগলো না। অবশ্যি এভাবে জরুরী তলবের মূল কারণটা কি সেটা জানতে না পেরে অতি কৌতূহলীরা বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলো। এ নিয়ে কিছুটা গবেষণা না হলো এমনও নয়। কিন্তু

হাতে তথ্য খুব সামান্য—ফোনের মুখে মহেন্দ্রবাবুর কথা থেকে এইটুকু মাত্র বোঝা গেছে, তার মেয়ে জয়া কিছু একটা অন্যায় করেছে। তা অন্যায় যে-ই করুক এবং সেটা যত গুরুতরই হোক, এই বুড়োমানুষটিকে এক্ষুণি আবার অতটা পথ হিচড়ে নেওয়ায় সকলেই মর্ম্মাহত। অনেকে তো বেশ রুষ্টই হয়েছে। বিশেষ করে রণেন। মহেন্দ্রবাবু বেরিয়ে যাবার পর থেকে একটি কথাও সে বলেনি। হাতে মাথা রেখে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে থমথমে মুখে অর্থহীন আঁকি-বুকি করছে হাতের পেনসিলটা নিয়ে। এ অমানুষিকতাকে সে আলোচনার বাইরে মনে করে। বিষণ্ণ মুখে দুঃখের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্ত্তা দু'চার জনের মধ্যে না হচ্ছিলো এমন নয়। কিন্তু সে আলোচনা কেবল মাত্র মহেন্দ্রবাবুর অসম্ভব কষ্ট নিয়ে। যে এই কষ্ট দিলো এবং সে-দেওয়াটা কত বড় অন্যায় সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য তারা সুসাবধানে এড়িয়ে চলে। এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস কেউ কারুর ওপর রাখে না—হয়তো কালই টের পাবে সাহেবের কানে তা পৌঁছে গেছে।

ক্রমশঃ

যাত্রী

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যে হবার আগেই মাঠ পার হোয়ে চলে আসি আমার কুঁড়েতে, যাই সাঁওতাল গ্রামে। ছোট্ট গ্রামখানি, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। নিকোনো আঙিনা, ঘর দোর কি পরিস্কার! সবলদেহ মেয়ে পুরুষ। দুজনেরই শরীর যেন ঢালাই-করা ইস্পাতের ফোয়ারা। মেয়েদের পরণে মোটা লাল পেড়ে শাড়ী হাঁটু পর্যন্ত, গলায় কুঁচের মালা। চুলে পরে তা'রা জবা ফুল। মনে হয় যেন কালো ইস্পাতের ডগায় কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যে বেলায় আকাশ-ছোঁওয়া বটগাছের তলায় বসে সাঁওতালদের সঙ্গে গল্প করি। মহুয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা ধরে আসে। মাদল বাজে; ছোটো ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে বেড়ায়। একবার জোর পরীক্ষা করলুম সাঁওতাল ছেলের সঙ্গে। গ্রামের লোক মেয়ে পুরুষ সব জুটলো বিকেল বেলা, মাদল বাজলো, আমরা দুজনে একটা রসি দুদিকে ধরে দাঁড়ালুম। কে কাকে টেনে নিতে পারে এই হোলো বাজি। জিতলুম আমি, শরীরে তখন দরকারের চেয়েও বেশী শক্তি ছিলো। গাঁয়ে বিয়ের ধুম লাগ্‌লো, লাল পেড়ে শাড়ী আর হাড়িয়ার খরচা যোগালুম আমি। এমনি কোরে তা'রা আমাকে আপনার কোরে নিলো, আমি নিলুম তাদের আপনার কোরে। সকাল সন্ধ্যা আমার ঘরে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের ঘোরাফেরা আসা যাওয়ার স্রোত বয়। এমনি কোরেই কাটছে দিন, একদিন গ্রাম থেকে ফিরে এলুম, শরীরটা জ্বর জ্বর বোধ হতে লাগলো, শুয়ে পরলুম মাদুরে, দুদিন পড়ে রইলুম জ্বরের ঘোরে অসহ্য মাথার যন্ত্রণায়। গাঁয়ের লোকেরা এলো খবর পেয়ে, গরুর গাড়ীতে পৌঁছে দিলো ষ্টেশনে, তুলে দিলো বোলপুরের গাড়ীতে। দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও আমার বড়োমা হেমলতা দেবী থাকতেন তখন নীচু বাংলায়। কোনো রুকমে এসে হাজির হলুম বড়োমার কাছে। কয়েকদিন বাদে জ্বর ছাড়তে কলকাতায় চলে গেলুম। ম্যালেরিয়া জ্বরের জের চললো অনেক মাস ধরে। বোনপাশের পাট উঠলো, সেখানে আর ফিরে যাওয়া হোলনা। কলকাতায় ফিরে এলুম অসাড় শরীর ও মন নিয়ে। চুপচাপ পড়ে থাকি ঘরে, যখন মন চায় গান গাই, যখন ভালো লাগে পড়ি। জীবনটা তখন যেন একটা

ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছে, কিছুতেই আর এগোতে পারছেনা। চুপ করে যাওয়াটা তখন নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র পথ ছিলো, নইলে ঘূর্ণির তলায় তলিয়ে যেতুম একেবারে। বাইরের অবস্থাও তখন আমারই মতো, সারা দেশ তখন এক ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী ঘূর্ণিতে আটকে গেছে, কিছুতেই জোর পাচ্ছেনা ঘূর্ণি থেকে বের হোয়ে যাবার। ধর পাকড় তখনো থামেনি, কেউটের মতো ছোবল্ মেরেই চলেছে বৃটিশ শাসকেরা।

জেল থেকে বের হোয়ে আসবার পরেই দেশবন্ধু এক নতুন কর্মপদ্ধতি হাজির করলেন দেশের সামনে। বাইরে থেকে আঘাত কোরে বিদেশী শাসন-যন্ত্র ভেঙে দেওয়া গেলো না, এবারে ওদেরি তৈরী আইন সভায় ঢুকে শাসন-যন্ত্রকে অচল কোরে দিতে হবে। গান্ধিজীর আইন-সভা বর্জনের নীতি পাল্টাতে হবে, এও অসহযোগ, তবে এ অসহযোগ আইন সভায় ঢুকে করতে হবে। সরে গিয়ে বৃটিশের পদলেহী ভারতবর্ষীয়দের দেশের নামে দেশের সর্বনাশ করবার সুযোগ দেওয়া হোয়েছে, এই দেশদ্রোহীদের তাড়াতে হবে। দেশের নামে সাম্রাজ্যবাদের সেবা করবার সব সুযোগ থেকে এদের বঞ্চিত করতে হবে। এই ছিলো দেশবন্ধুর নতুন কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। গান্ধিজী এই নতুন কর্মপদ্ধতি মানতে পারলেন না, বাধাও কিন্তু তিনি দিলেন না দেশবন্ধুকে এই নতুন কর্মপদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে। স্বরাজ পার্টির পত্তন হোলো। মতিলাল নেহরু, জিন্না, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি নেতার দল যোগ দিলেন। ইলেক্‌সনের ধুম পড়ে গেলো দেশে। বৃটিশের জো-হুকুমের দল কোথায় গেলো ভেসে স্রোতের মুখে কচুরী-পানার মতো। স্বরাজ পার্টির লোকে আইন সভা গেলো ভরে। শাসন-যন্ত্র অচল কোরে দেবার জন্যে দেশবন্ধু মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। টাউন হলের দোতলায় তখন কাউন্সিলের অধিবেশন হোতো। দেশবন্ধু অসুস্থ ছিলেন, ট্রেচারে শুইয়ে তাঁকে দোতলায় তোলা হোলো। নীচে লোকের ভিড়। উপরে গ্যালারীতে আমরা ভিড় কোরে বসে আছি। সুভাগৃহে উত্তেজনার ঢেউ বইছে, আসা-যাওয়ার অন্ত নেই। সভার আরম্ভে বাঙলার গভর্ণর লর্ড লিটন এসে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব যেন না আনা হয় এই অনুরোধ জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। লর্ড লিটন বক্তৃতা দিয়ে যেতে না যেতেই দেশবন্ধু আনলেন অনাস্থা প্রস্তাব। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হোল। আমরা জয়ধ্বনি তুললুম দর্শকের গ্যালারি থেকে, নীচে জয়ধ্বনি তুললো

অপেক্ষায়মান জনতা। কর্টন সাহেবের আদেশে আমাদের বের করে দেওয়া হোল গ্যালারি থেকে। লর্ড লিটন আবার কয়েকটি জো-হুকুম জুটিয়ে মন্ত্রী বানালেন। আবার তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এলো, পাশও হোলো। এই রকম কোরে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বার বার তিনবার অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করালেন দেশবন্ধু।

জো-হুকুম গোলামের দল মন্ত্রী হোতে পারলো না বটে কিন্তু শাসন-যন্ত্র একটুও অচল হোলো না। ব্রিটিশ গভর্ণর তাঁর পরামর্শদাতাদের সাহায্যে তোফা আরামে শাসন করতে লাগলেন। বিদেশী শোষকদের শাসন-যন্ত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র চিড় ধরার লক্ষণ দেখা গেলোনা। আইন সভায় বক্তৃতা দিয়ে ভোট দিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ কোরে কি অত্যাচারী শাসকদের হটানো যায়; ক্ষমতা দখল করা যায়?

স্বরাজ পার্টি সম্বন্ধে প্রথম থেকেই আমার মনে সন্দেহ ছিলো, বিরূপতাও ছিলো। আইন সভার মধ্যে ঢুকে যে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধতা করবার দরকার আছে আর বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থাতে সেটা যে অত্যন্ত জরুরী কাজ এ জ্ঞান তখন আমার ছিলোনা। গান্ধিজী এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজী হননি, এই ছিলো আমার কাছে সবচেয়ে দামী যুক্তি। তাছাড়া স্বরাজ পার্টি সম্বন্ধে আমার সাহজিক (instinctive) বিরূপতা ছিলো খুব জোরালো। যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু মন বলছিলো এ পথে হবে না। কাউন্সিলে বক্তৃতা দিয়ে দেশ স্বাধীন করা যায় না। রাস্তাটাকে করতে হয় বিপ্লবের নদী আর তাতে ডেকে আনতে হয় জোয়ার গণ-সমুদ্র থেকে তবে দেশ স্বাধীন হয়, আর সে পথ আমাদের দেখিয়েছেন গান্ধিজী, দেশবন্ধু নয়। এর দু' এক বছর পরে গণবাণীতে একটি প্রবন্ধে স্বরাজ পার্টিকে আমি উকীল ব্যারিষ্টার জমিদার বাবুদের দল বলে অভিহিত করি। আমার সহজ-বুদ্ধির (instinct) যে সন্দেহ ছিলো তা'র যথার্থতার যাচাই হোয়ে গেলো পরবর্তী কালে যখন আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষনের ক্ষমতা লাভ করলুম। তখন বুঝলুম স্বরাজ পার্টি শুধু কাউন্সিল ঘরে হাত ছুঁড়ে বক্তৃতা দেবার কর্মপদ্ধতি নিয়েছে। বুঝলুম স্বরাজ পার্টির নেতাদের মধ্যে এক জনও গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন না। বাইরের গণ-আন্দোলনের সম্পূরক হিসেবে আইন সভায় গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধতা করার কর্ম-পদ্ধতি স্বরাজ পার্টির নেতারা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা রাস্তা থেকে একেবারে সরে পড়ে সাত তাড়াতাড়ি ঢুকে বসেছিলেন কাউন্সিলের

ঘরে। রাস্তা থেকে সরে পড়ার যে রূপ স্বরাজ পার্টির প্রত্যেকটি নেতার চেহারায়, বক্তৃতায়, ও কর্মে ফুটে উঠেছিলো তারি বিরুদ্ধে আমার মনে সাহজিক সন্দেহ ও বিরূপতা দেখা দিয়েছিলো। গণ-আন্দোলনের বৈপ্লবিক পন্থা ছেড়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বাঁধা সড়কে দেশকে হাঁটি হাঁটি পা পা করাবার মতলব নিয়ে তৈরী হোলো স্বরাজ পার্টি। নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীতে আন্দোলন কোরে দেশ স্বাধীন কোরতে হবে, প্রস্তাব পাশ কোরে বৃটিশ পার্লামেণ্টে পাঠিয়ে দিয়ে শাসকদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত কোরে দেশ স্বাধীন করতে হবে, কংগ্রেসের এই নককারজনক নীতির নাগপাশ থেকে গান্ধিজী আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নয়, গভর্মেণ্টের তৈরী আইন অমান্য কোরে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী কোটি কোটি লোকের বিরুদ্ধতা উদ্বুদ্ধ কোরে, সংহত কোরে, গণ-আন্দোলন সৃষ্টি কোরে দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে এই হোলো গান্ধিজীর প্রদর্শিত পথ। স্বরাজ পার্টি আবার দেশকে সেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকেই টেনে নিয়ে গেলো। কাউন্সিল ভবনে বক্তৃতার বাজিখেলা দেখানো হোলো অনেক, রাস্তা কিন্তু একেবারে অসাড়, নিঝুম, প্রাণহীন হোয়ে গেলো। গান্ধিজী চলে গেলেন জেলে আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় আন্দোলনের কোটাল বইয়ে দেবার যে একটি মাত্র লোক ছিলেন সারা ভারতবর্ষে তিনি গেলেন চলে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে।

মনে বড় অশান্তি, কি যে করবো কিছুই ঠাওর কোরে উঠ্‌তে পারছিলুম না। সারা দেশও যেন আমারই মতো দিশেহারা হোয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলো।

এই রকম যখন আমার মনের অবস্থা তখন আমার এক দাদা সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী আমার বৌঠাকরণ বরোদা থেকে কলকাতায় এলেন। দাদা সুপ্রকাশ তখন বরোদা মিউজিয়মের কিউরেটার ছিলেন। বৌঠাকরুণ যখন আমাদের বাড়ীতে বউ হোয়ে আসেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র দশ আর আমার বয়েস সাত। সেই ছেলেবেলার হাল্‌কা আলোভরা দিনগুলোর অনেক খেলাধূলো দুষ্টুমির সঙ্গী ছিলেন আমার বৌঠাকরুণ। তিনি আর আমার দাদা আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন বরোদায়। সেটা ১৯২২ সালের কথা। বরোদাতে আলাপ হোলো ডাঃ সুমন্ত মেহতার সঙ্গে ও তাঁরি বাড়ীতে আলাপ হোলো ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের সঙ্গে। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক তখন গান্ধিজীর অন্যতম শিষ্য, গুজরাটের কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে সেরা বলে গণ্য। ইন্দুলাল আমাকে

আহমেদাবাদে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। আহমেদাবাদে পৌঁছলুম সকালে। তখনই সবরমতী আশ্রম দেখবার জন্য রওনা হলুম। নদীতে শুধু বালির ঢেউ চোখে পড়ে, কোথাও কোথাও ক্ষীণ জলের রেখা। নদীর ধারেই মহাত্মাজীর বাসস্থান। পাথরে তৈরী ছোট্ট বাড়ীটি ; বারাণ্ডা আর বারাণ্ডা-সংলগ্ন ঘর। ঘরে দরজার বালাই নেই, কোনো আসবাবও নেই ঘরে। যতদূর মনে পড়ছে যীশু-খৃষ্টের ছবি ঝোলানো ছিলো দেয়ালে। অনেকক্ষণ গান্ধীজির কুঠিরে বসে সমস্ত প্রাণ দিয়ে কঠোর তপস্যার শুচিতা অনুভব করতে লাগলুম। আমার বুকের মধ্যে আমার মন যে চির-জাগ্রত বৈরাগী। তাকে বাইরের জীবনের কতো রঙীণ ধূলো দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছি, তবুও সে কি বাগ মানে? যখনই সবরমতী আশ্রমের মতো কোনো জায়গায় গিয়ে হাজির হোয়েছি তখনই সে বুকের পাঁজর ধরে কি ঝাঁকুনিই না মেরেছে আমাকে!

গুজরাটে দু'মাস কাটিয়ে ফিরে এলুম কলকাতায়। শরীর ও মন থেকে অবসাদের ধূলো ঝেড়ে ফেলেছি অনেক পরিমাণে। কাজ করবার জন্যে তাগিদ আস্‌তে লাগলো মনের ভিতর থেকে, কিন্তু ঠিক কি যে করবো তা স্থির কোরে উঠ্‌তে পারছিলুম না। যা হাতের কাছে পাই তাই পড়ি, গান গাই, বাঁশী বাজাই, সকাল সন্ধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম করি, এমনি কোরেই আমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে গান্ধিজী ছাড়া পেলেন। তা'র কিছুদিন পরেই দেশবন্ধু হঠাৎ মারা গেলেন দার্জিলিংয়ে। দেশবন্ধুর মৃতদেহ দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আনা হোলো। সকাল বেলা আমি আর চপলা শেয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। ষ্টেশনের ভিতরে, ষ্টেশনের প্রাঙ্গনে, সার্কুলার রোড আর হ্যারিসন্ রোডে লক্ষ লোকের ভীড়। ট্রেণ এলো, মৃতদেহ ফুল দিয়ে ঢেকে শোভাযাত্রা সুরু হোলো। হ্যারিসন্ রোড আর সার্কুলার রোড যেখানে এসে মিলেছে ঠিক সেইখানে রাস্তার একধারে মোটরের উপরে দাঁড়িয়ে মহাত্মাজী জনতাকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি কলকাতায় চলে আসেন। বিরাট জনতার সঙ্গে আমরাও চললুম দেশবন্ধুর শব অনুগমন কোরে। পথের ধারের দু'পাশের বাড়ী থেকে ফুল ঢেলে দিতে লাগলো দেশবন্ধুর মৃতদেহের উপর। চৌরঙ্গী হোয়ে শোভাযাত্রা থামলো গিয়ে দেশবন্ধুর বাড়ীর সামনে। সেখানে তাঁর মৃতদেহ নামানো হোলো বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর কিছুক্ষণের জন্য। কেওড়াতলা শ্মশানের কাছাকাছি থেকে

আমি আর চপলা ফিরে এলুম। আমাদের দুজনেরই মন ভারাক্রান্ত, চপলার চোখ উপরন্ত অশ্রুসিক্ত।

আমার মনের মাটিতে দেশবন্ধুর প্রভাবের কোনো চিহ্ন পড়েনি। তাঁর রাজনীতি আমার মনকে কখনো টানেনি, তাঁর বক্তৃতাও আমাকে কখনও অভিভূত করেনি। গান্ধিজীর বক্তৃতার আর কর্মের স্বাদ পাবার পর আর সব নেতাদের বক্তৃতা, আচরণ ও কর্ম নেহাৎ পান্‌সে ঠেকতে লাগলো আমার কাছে। গান্ধিজী দেশকে যে পর্যন্ত ঠেলে এগিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের বন্ধ্যা রাজনীতিকে ফসল ফলাবার যে শক্তি তিনি দিলেন, তারপরে দেশবন্ধুর রাজনীতি দেশকে একপাও এগিয়ে দিতে পারেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে যে উগ্র ন্যাশানালিজম্ দেশের অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতীতের ভালোমন্দর বিচার না কোরে গোটা অতীতটার জয়গান করতে সুরু করে। যে লোক যতো উগ্র উন্মত্ততার সঙ্গে সেইটে করতে পারে, দেশের সাধারণ লোকদের কাছ থেকে সে ততো বেশী খাতির আদায় করে নেয়। অন্ধ ন্যাশানালিজমের খেলো ভাবপ্রবণতার ঝোঁকে বাঙালী অনেক বার নিজের দেশের নোংরাকে বুকে চেপে ধরে তার স্তবগান করেছে। হাটের লোক চেঁচিয়ে বাহবা দিয়েছে—আহা! দেশের প্রতি অমুকের কি গভীর ভালোবাসা, দেশের নোংরাটাকেও সে বুকে স্থান দিয়েছে! আসলে কিন্তু এটা ভালোবাসা নয়, এটা নোংরামি বাঁচিয়ে রাখবার সর্বনাশী খেলা। এ কথা আমাদের জানা একান্ত দরকার যে ন্যাশানালিজম্ আর দেশের যেটা মহৎ, সত্য ও সুন্দর সাধনা ও সৃষ্টি, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। রামমোহন রায় ভারতবর্ষকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন, কি শ্রদ্ধাই না তাঁর ছিলো ভারতবর্ষের বিরাট সত্য সাধনার প্রতি। তাই বোলে দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে কালীঘাটের পাঁঠাবলি, সতীদাহ প্রভৃতি জঘন্য কুসংস্কার তিনি কখনো মেনে নেন নি কিম্বা তাদের সাফাই গাইতে তিনি কখনো চেষ্টা করেন নি। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরেই তিনি দেশের প্রতি সত্য ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের প্রতি এই সত্য ভালোবাসার উদাহরণ শক্তিমান মানুষেরা তাঁদের কর্মের দ্বারা বারে বারে ধরে দিয়েছেন সকলের সামনে সকল দেশে।

দেশবন্ধু এ পথে গেলেন না। ভাব-বিলাসী বাঙালীর যেখানে দুর্বলতা, ঠিক সেই দুর্বলতার উপর ঝোঁক দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করলেন তিনি।

যে চলার পথ গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের অগ্নি-শিখার দহনে শুকিয়ে এসেছিলো সেই পথ দেশবন্ধুর ভাব-রসের বর্ষণে আবার চ্যাট্‌চ্যাটে হোয়ে গেলো। বাঙালী রাজনৈতিক ধুলোটে মন দিলো। ভাব-রসের বর্ষণে চলার পথকে চ্যাট্‌চ্যাটে কোরে তোলাতে আমার ঘোর আপত্তি, ওতে কাদায় পা অবশ হোয়ে যায়, চলা যায় না। বাঙালীর মন অতি সহজে জয় করবার জন্যে দেশবন্ধু ভাবোন্মাদনার পন্থা নিয়েছিলেন, হাতে হাতে ফলও পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু এপথ মুক্তির পথ নয়, সর্বনাশের পথ! তা'ছাড়া এক দিকে যেমন ভাব-রসের হোলিখেলা চল্‌লো বক্তৃতায় আর 'নারায়ণ' পত্রিকার পাতায়, অন্যদিকে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রকার নোংরামির বেপরোয়া আমদানী করা হোলো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করাবার জন্যে যে কি সব জঘন্য কৌশল অবলম্বন কর্‌লো স্বরাজপার্টি, তা' সে দিনের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল প্রত্যেকটি লোক জানে। রাজনৈতিক জীবনের সুর সেই যে নামিয়ে দিলো স্বরাজ-পার্টি তার জের এখনো চল্‌ছে বাঙলা দেশে।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধীজি কল্‌কাতায় রয়ে গেলেন এক মাস। দেশবন্ধুর বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। একদিন সকালে তিনি জোড়াসাঁকোয় এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে আমন্ত্রণ জানালেন শান্তিনিকেতনে যেতে, গান্ধীজি সম্মত হোলেন। গান্ধীজি যে দিন শান্তিনিকেতনে যাত্রা করলেন, আমিও সেদিন চল্লুম শান্তিনিকেতন। সেবার শান্তিনিকেতনে প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন গান্ধীজি। দু'দিন সকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হোলো, আমরা চুপচাপ বসে তাঁদের আলোচনা শুনলুম। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজির অভিযান নিয়েই বেশীর ভাগ আলোচনা হোলো। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গান্ধীজি জাতীয়তাবাদের যে বেড়া তুলছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটা কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারছিলেন না। এতে দেশের অকল্যাণ হবে, আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হবে, এটা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ধারার বিরুদ্ধ পথ, এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বার বার বলছিলেন। এ জায়গায় গান্ধীজির সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরের কোনো মিল ছিলো না। একজনের সুরে বাজছিলো শুধু বর্তমান, আর একজনের সুরে ধ্বনিত হচ্ছিলো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত।

শান্তিনিকেতনের দোতলায় থাকতেন গান্ধীজি। মাঝের বড়ো ঘরটিতে

খদ্দরের চাদর-ঢাকা বিছানায় বসে তিনি চর্‌খা কাটতেন আর আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বল্‌তেন। দূর গ্রামগুলি থেকে শত শত লোক রোজ ভিড় কর্‌তো এসে তাঁর বাস-ভবনের চারপাশে, একটি বারের মতো তাঁকে দেখবার জন্যে। সন্ধ্যেবেলা বারাণ্ডায় ক্যম্পখাটে তিনি শুয়ে থাক্‌তেন, আমরা বসতুম মাটিতে। তিনি আস্তে আস্তে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কি ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলেছিলো তা'র গল্প করতেন। গান্ধীজীর সঙ্গেই আমি শান্তিনিকেতন থেকে কল্‌কাতায় ফিরে আসি। তা'র কিছুদিন পরেই শ্রীমতী এলো কল্‌কাতায়, পরণে তার পাত্‌লা শাড়ী। ঠাট্টা কোরে বল্লুম,—বিলিতী শাড়ী আবার কবে থেকে পরা সুরু হোলো? উত্তরে শুনলুম—এটা বিলিতীসুতোয় বোনা শাড়ী নয়, এটা আহমেদাবাদ মিলের শাড়ী, সুতোও দিশী। বিশ্বাস হোলো না, তর্ক বেধে গেলো। আমি মান্‌তে চাইলুম না যে এতো মিহি সুতো আমাদের দেশে তৈরী হয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো গান্ধীজি তো কল্‌কাতায়, তাঁর কাছে গেলেই তো মীমাংসা হোয়ে যায়! ছুটলুম দু'জনে দেশবন্ধুর বাড়ী। রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় মাটিতে পাতা বিছানায় বসে ছিলেন গান্ধীজি। হেসে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। মাটিতে বসলুম দু'জনে, জানালুম তাঁকে তাঁর কাছে ছুটে আসবার হেতু। আমার হার হোলো।

বর্ষা ঘনিয়ে এলো। আকাশে কালো মেঘের ছুটোছুটি। লালবাড়ীর (বিচিত্রাভবনের) কোণে কদমগাছ ছেয়ে গেলো ফুলে ফুলে। হঠাৎ খেয়াল হোলো-বর্ষার গানের মজলিশ কোরলে তো হয়! অমনি বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে গান শেখাতে সুরু করলুম। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত কোরে রবীন্দ্রনাথকে লিখলুম কল্‌কাতায় আস্‌তে। তিনি এলেন, বিচিত্রাভবনের দোতালায় হোলো গানের আসর। রবীন্দ্রনাথ বসলেন আমাদের সাম্‌নে, পড়ে শোনালেন দু'টি কবিতা। তা'র পরের বার বর্ষা-মঙ্গলের আয়োজন করলুম বিচিত্রা-ভবনের একতলায়। নন্দিতা তখন সাত আট বছরের, নাচ্‌লো সে "কদম্বেরি কানন ঘেরি" গানের সঙ্গে। কনক দাশের গলায় 'অশ্রুভরা বেদনা' রসের আবেশে মন্থর কোরে তুল্‌লো শ্রোতাদের মন। গানের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিলো রজনীগন্ধার গন্ধ, কেয়ার সুরভি।

নানা রঙের সুতোয় বোনা আঁচ্‌লার মতো আমার জীবনটা তখন নানা রঙে রঙীন। তখনো একরঙা হোয়ে যায় নি জীবন।

চল্‌ছি, মনের মধ্যে পথ নেই, শুধু চলার অভ্যেসের ঝোঁকে চলেছি। এই অর্থহীন চলা আমি চলছিলুম এই সময়। চৌরিচৌরার পর গান্ধীজি যখন আন্দোলন বন্ধ কোরে দিলেন তখন আঘাত পেয়েছিলুম মনে। কোথায় একটা গলদ আছে সেটা অনুভব করছিলুম, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে সেটা ধরতে পারছিলুম না। গভীর অসোয়াস্তি আঁচড়ে চলেছিলো বুকের মধ্যে। যে চল্লার পথ মনের মধ্যে জেগে উঠেছিলো, সেই আলোয় ঝল্‌মল্‌-করা দিগন্ত-ছোঁওয়া পথ হঠাৎ যেন ছোটো হোয়ে গেলো, হাতের নাগালের মধ্যে সরে এলো। দূরের ডাক আর বাজলো না সেই পথে, মনে হোতে লাগ্‌লো এ পথ আর মুক্তির দূতী নয়, এ পথ পায়ের শিকল, কারাগার। মনের মধ্যে সেই ছোট্ট পথে এগোচ্ছি আর পেছচ্ছি মাকুর মতো। কোনই আনন্দ পাচ্ছিনে সে চলায় অথচ অন্য পথও নজরে পড়ছে না। এই অবস্থায় পড়ে আমার মন সেদিন নাজেহাল।

গান্ধীজির আর গান্ধীজির মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সেদিন ছিলেন দেশবন্ধু আর ছিলো তাঁর কর্মপদ্ধতি। স্বরাজ পার্টির নেতারা কিম্বা দলের মজলিশি নিয়মতান্ত্রিক বক্তৃতা-সর্বস্ব রাজনীতি,—এ দুয়ের কোনটাই আমার মনকে স্পর্শ করেনি। স্বরাজ পার্টির রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি মানা, পথ থেকে ড্রইং রুমে ফিরে যাওয়ার সামিল। আমি আদবেই রাজী ছিলুম না তা'তে। গান্ধীজি যে পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে, সে পথের সত্যিকার স্বাদ পেয়েছিলো আমার মন। সে পথ যখন ছোট্ট বলে মনে হোতে লাগলো তখন এগিয়ে যাবার জন্যে ব্যাকুলতা জাগলো মনে। যে পথ দিগন্ত-প্রসারী বলে মনে হোয়েছিল সে পথ কেন ছোট হোয়ে গেলো, কেন আলো সরে গেলো পথের বুক থেকে, আবার কোন্ পথ ধরবো, সে পথই বা কোথায় নিয়ে যাবে—এই সব প্রশ্ন তীরের মতো অহরহ বিঁধছিলো বুকে। এগিয়ে যাওয়ার কথাই ভাবছিলুম সেদিন, পথ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবার কথা এক মুহূর্তের জন্যেও মনে আসেনি। স্বরাজ পার্টির পলিটিক্যাল সাইনবোর্ড আঙুল দেখাচ্ছিলো পেছনে ঘরের দিকে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিকে নয়। আইনের বাঁধ-ভাঙা গণ-আন্দোলনের বিদ্রোহী জোয়ারের সঙ্গে কোলাকুলি করবার পর এ যেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের খিড়কীর পুকুরের পচা জলে চোখ কান বুজে ডুব দেওয়ার ব্যবস্থা! দেশের জনসাধারণ স্বরাজ পার্টির রাজনীতি কখনো গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করেছিলো

শুধু উকীল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী আর জমিদার, এক কথায় সমাজের উপর তলার আর মাঝের তলার বাবুদল। এই বাবুরা তেতলা-দোতলায় যে রাজনৈতিক হুল্লোড় করতেন তার ধ্বনি সমাজের বিরাট একতলায় কখনো পৌঁছয়নি। বাবুদের চিকণ কণ্ঠে আর যাই থাক্, এ তাগদ আদবেই ছিলো না!

মনের মধ্যে অশান্তি বেড়েই চলেছে। আগে যেমন নিঃসংশয় আনন্দে গান্ধীজির কথা গ্রহণ করেছিলুম, সেটা আর পারছিলুম না। বাস্তবের ধাক্কায় গান্ধীজির মতবাদের মধ্যে অনেক ফাটল দেখা দিলো। চরখার সুতো দিয়ে ব্রিটিশ সিংহীকে আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে সাগর পার কোরে দেওয়া সম্ভব হবে, এই কল্পনায় মন আর সায় দিচ্ছিলো না। ব্রিটিশ বেনের পকেটে লুটের টাকা কিছু কমে যেতে পারে, আগের মতো ভরা না থেকে পকেটটা কিছুটা চুপ্‌সেও যাবে হয়তো, কিন্তু তাতেই বা হবে কী? যে বিরাট লুঠ করে চলেছে বৃটিশ বেনের দল ভারতবর্ষে, তা'র কতোটুকু অংশই বা সেটুকু যেটুকু বিলীতি কাপড়ের সিঁধ কাঠি দিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে নিয়ে যায় তা'রা? চরখার সুতো দিয়ে বৃটিশ সিংহীর নাকে সুড়সুড়ি দেওয়া যেতে পারে, তাতে তা'র ঘুমের অসুবিধা হবে হয়তো কিছুটা, কিন্তু তাই বলে সুড়সুড়ি দিলে সে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাবে এ কথা আষাঢ়ে বলে মনে হোতে লাগল। চরখার সমর্থনে আর একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছিলো তখন। এই যুক্তি-দেখানে-ওয়ালাদের মতে চরখার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আমরা যোগ স্থাপন করতে পারবো। চরখা হোচ্ছে গণ-সংযোগের উপায়। এই যুক্তিটা মানতে একটুও বাধা ছিলো না, শুধু বাধা সৃষ্টি করলেন এই যুক্তির সমর্থকেরা চরখাকে গণ-সংযোগের একমাত্র উপায় বোলে মানিয়ে নেবার জন্যে জবরদস্তি সুরু কোরে। নানা উপায়ে জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন করা যায়, চরখা তা'র একটা উপায়। বিনি পয়সায় কিম্বা অতি অল্প মূল্যে ওষুধের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরে দিয়ে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কোরে, সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন কোরে, জমিদার মহাজনদের অত্যাচার থেকে চাষীদের বাঁচাবার জন্যে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ গঠন কোরে, এই রকম কতো শত উপায় আছে জনসাধারণের মনে পৌঁছবার। জনসাধারণের মনে পৌঁছবার জন্যে দরকার দরদী মন। এই মনটা থাকলে উপায়ের কমতি কখনো হয় না। কে বল্‌লে যে একমাত্র চরখার চাকা ঘুরিয়েই পথ কেটে যাওয়া যায় জনসাধারণের মনের দিকে, আর কোনো উপায়েই সেটা সম্ভব নয়! চরখাই গণ-সংযোগের

একমেবাদ্বিতীয়ম্ উপায় এই যুক্তিহীন গোঁড়ামী প্রচার কোরেছিলেন সেদিন গান্ধীবাদীরা চরখা চালু করবার যুক্তি স্বরূপ। এই অন্ধ গোঁড়ামি স্বীকার করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। জীবনের সমস্যা ও তাদের সমাধানের বহুমুখি উপায় চিরকালই থাকবে। একটা মনগড়া একপেশে সমাধান তৈরী কোরে সেইটিকে সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায় বোলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা প্রমাণ করে বিচার-বুদ্ধির অভাব, বিশ্লেষণ-ক্ষমতার দৈন্য ও মনের আল্‌সেমি। বাজারে এই একপেশে টোটকাগুলোর কাট্‌তিও হয় বেশ, শুধু হয় না সমস্যার সমাধান, এই যা। জীবনের সমস্যাগুলির যে স্বভাবগত জটিলতা আছে তার চেয়েও তাদেরে মনগড়া বেশী জটিলতা আরোপ করা হচ্ছে ভাব-বিলাসীদের একটি অতিবুদ্ধির ঢঙ, তেম্‌নি আবার একটি সমস্যার বহুমুখি প্রকৃতি বিশ্লেষণ না কোরে তা'র প্রকৃতির একটি বিশেষ দিককে তার গোটা প্রকৃতি বলে কল্পনা কোরে নিয়ে সমাধানের বিধান দেওয়া অল্পবুদ্ধির ব্যভিচার। মানছি যে এই ধরণের কাল্পনিক সমাধান সহজ আর সহজ বলেই আল্‌সে মনের মালিকেরা এটা করে থাকে; কিন্তু এই সব সমাধানে মগজের ছাপ আদবেই নেই। ভাব-রসের বেলায় সহজিয়া পথ ধরা চলে, অন্তত লোকে ধরছে সে পথ। বিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু সহজিয়া সাধনা সর্বনাশের চোরাবালি, আলেয়ার হাতছানি। খিলাফৎ আন্দোলনকে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গান্ধীজি যে ভয়ানক ভুলটি করেছিলেন সেটিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম এই সময়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান করবার জন্যে ইস্‌লাম ধর্মে বিশ্বাসী একদল ভারতীয়দের খিলাফতের ঘুঁস দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইতে টানতে হবে এটা গোড়া থেকেই আমার কাছে অশোভন ঠেকেছিলো। অল্প দিনের মধ্যেই বাস্তবের আলোতে পরিষ্কার ধরা পড়ে গেলো যে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের টান দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিকে ততোটা নয় যতোটা খিলাফৎ আন্দোলনের দিকে। যেটুকু তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেটা খিলাফৎ আন্দোলনের ফায়দা হবে এই আন্দোলনে যোগ দিলে, এই পাটোয়ারী বুদ্ধির হিসেব কসারই ফল। ইস্‌লামের বিশ্বব্যাপী ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীকরণ বিপ্লবমূলক আন্তর্জাতিকতার বিরোধী তো নিশ্চয়ই, এমন কি বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকতারও বিরোধী। ইসলামের এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীকরণ আন্তর্জাতিকতা তো নয়ই, এমনকি এটা জাতীয় বিপ্লবেরও বিরুদ্ধ

শক্তি। ইসলামপন্থীরা যে দাবী করে থাকেন যে তাঁরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী নন, তাঁরা আন্তর্জাতিকতার উপাসক, সেই দাবী এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে আন্তর্জাতিকতা বলে চালিয়ে দেবার ফাঁকির উপর প্রতিষ্ঠিত, ঠিক যেমন ইসলামের মাসাওয়াৎকে (সমতাকে) অর্থাৎ ধনী গরীবের একই সঙ্গে নামাজ পড়ার রীতিকে কমিউনিজমের সমতার নজীর হিসেবে চালিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা বিলকুল ফাঁকি। ইস্‌লামের এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে চূর্ণ বিচূর্ণ কোরে দিয়েছিলেন কেমাল পাশা, বিদায় কোরে দিয়েছিলেন তাকে তুর্কী থেকে। তবেই না নব্য তুর্কীর বিপ্লবপন্থী জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে তুর্কিকে মুক্ত কোরতে পেরেছিলো! মৌলানা শৌকৎ আলী বৃটিশ গভর্মেণ্টের অর্থে তুর্কী গিয়েছিলেন খলিফার হোয়ে ওকালতি করবার জন্যে। সেখানে গোঁড়ামীমুক্ত আঙ্গুয়ান-পন্থী মুসলমানদের হাতে প্রতিক্রিয়ার মেদময় মূর্তি এই মৌলানা যে কি জবরদস্ত লাঞ্ছিত হোয়েছিলেন তা' রাজনীতির খবরদারী-করনেওয়ালারা সবাই জানেন। এই ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতাকে আঘাত তো কোরলেনই না গান্ধীজি, এমন কি তিনি এই উন্মত্ত গোঁড়ামির পাশ কাটিয়েও গেলেন না। এই খলিফা-কেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক অন্ধতা কামাল পাশার প্রবল আঘাতে মুস্‌ড়ে পড়েছিলো, ও দম নিয়ে ঠেলে ওঠবার জোর খুইয়ে বসেছিলো। খিলাফতের চুপ্‌সনো বেলুনে হাওয়া ভরে দিলেন গান্ধীজি। তিনি পুষ্ট করলেন ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব-বিরোধী এই প্রতিক্রিয়াকে। কামাল পাশার লাথি খেয়ে যে দানব কলসীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো ও ছিলো বন্দী সেখানে, কলসী খুলে সেই দানবকে মুক্তি দিলেন গান্ধীজি। তার ফলে যে শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লবের সর্বনাশ করা হোলো তা নয়, গোঁড়ামীর বিষাক্ত বাষ্পকে উড়িয়ে দেবার জন্যে ইসলামীয় দেশগুলিতে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার যে পূরবৈয়া বায়ু বইছিলো, তাকে হটিয়ে দিয়ে সেই দেশগুলিতে সনাতনী প্রতিক্রিয়ার দুর্গন্ধময় বাষ্পকে আবার চাঙ্গা হোয়ে খিতিয়ে বস্‌তে সাহায্য করলেন গান্ধীজি। হিন্দুদের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা কোরে, ইংরেজের মতলবী উস্‌কানি অগ্রাহ্য কোরে, ভারতবর্ষের মুসলমান আস্তে আস্তে শিখছিলো ভারতবর্ষকেই আপনার বোলে বুঝতে, জানতে ও ভালোবাসতে। যে কোনো উপায়ে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের টেনে নেবার জন্যে খিলাফৎ আন্দোলনে কংগ্রেসের সমর্থনের ঘুঁস দিলেন তিনি তাদের। গান্ধীজিই তাদের

দৃষ্টি ধর্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতার দানবের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনি কোরে তিনি সেদিন ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবে নিজের অজানিতে সর্বনাশের যে বীজ বুনলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, পাকিস্তান হোলো তারই ফসল।

স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের সরিয়ে নেবার জন্য সুচতুর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খিলাফতের দাবী মেনে নিলো, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা-আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানদের যেটুকু স্রোত বইছিলো তাঁতে ভাঁটা পড়ে গেলো। শৌকত আলি, মহম্মদ আলি স্বমূর্তি ধরলেন, গোষ্ঠীর লোকদের খুসী করবার জন্যে জাতীয়তাবাদের আলখাল্লা তাঁরা সাত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলতেই তলা থেকে বের হোয়ে পড়লো তাঁদের আসল সাম্প্রদায়িক সাজ —চাঁদমার্কা টুপি আর সবুজ আলখাল্লা।

হিন্দু সমাজকে খুসি করবার জন্যে গান্ধীজি জাতিভেদ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখলেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তাতে আমি দুঃখ পেয়েছিলুম। আমার পক্ষে জাতিভেদ মানা কোনোমতেই সম্ভব ছিলোনা। এই প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণভাগকে গান্ধীজি শাশ্বত সমাজ ব্যবস্থা বোলে বর্ণনা করলেন। জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি কোরে গান্ধীজি দেখালেন যে প্রাচীন কালের সামাজিক ব্যবস্থায় কাজ ভাগ কোরে বেঁটে নেওয়ার চাহিদার তাগিদেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি। এই ঐতিহাসিক আলোচনায় নতুন কোরে শেখবার কোনো কিছু না থাকলেও আপত্তি করবার কিছু ছিলো না। প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই ঐতিহাসিক কারণের দোহাই দিয়ে তাকে শাশ্বত বোলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক তো নিশ্চয়ই, অনুচিতও। ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি আর যা প্রমাণ করুক না করুক এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে একটি প্রথার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হোয়ে যাবার পর সেই প্রথার সামাজিক জীবনে জায়গা জুড়ে থাকবায় কোনো ঐতিহাসিক কিম্বা সামাজিক অজুহাত নেই। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও যে তা'রা থেকে যায় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে থাকা মানুষের চলার পথের বাধা সৃষ্টি করে, সমাজের ধেয়ে-যাওয়া এগিয়ে-চলা স্রোতের মুখে রচনা করে মরা বালির বাঁধ। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-প্রণালী ও বিচার-পদ্ধতি গান্ধীজি ব্যবহার করলেন বর্তমান কালে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের সাফাই গাইবার জন্যে। ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি যেটা প্রমাণ করে সেটা হচ্ছে প্রতিটি সামাজিক প্রথার ও সামাজিক

সংগঠনের সাময়িকতা, তা'র অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন কিম্বা বিলুপ্তি। এই বিচার-পদ্ধতির একেবারে অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার কোরে ঠিক বিপরীতটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন গান্ধীজি। তিনি অস্পৃশ্যতার নিন্দা করলেন বটে কিন্তু তা'রই সঙ্গে হিন্দুসমাজের বর্ণবিভাগকে শাশ্বত বলে জাহির করলেন।

চতুর্বর্ণ প্রথাই যে অস্পৃশ্যতার হেতু, এই প্রথা যে মানুষের পক্ষে অসম্মানজনক ছোঁওয়াছুঁয়ির কদর্থে ভরা, সে কথা গান্ধীজি বেবাক এড়িয়ে গেলেন! তাঁর মামুলী যুক্তির বাঁধুনি ছিলো ঢিলে ঢালা; তাতে ফাঁকি ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু ভক্তদের ভক্তি-আবিল চোখে কবে কোনদিন গুরুর কথার ফাঁক ধরা পড়েছে! ভক্তির মৌ দিয়ে রচা মনের মৌচাক একেবারে নীরেট, সেখানে বুদ্ধির মধু ভরবার এতোটুকু ফাঁক থাকে না। গান্ধীজির ভক্তদের মনের মৌচাকে সেদিন এতোটুকু ফাঁক ছিলো না। অন্ধ ভক্তির মোম দিয়ে প্রতিটি ফাঁক বুজিয়ে দিয়েছিলো ভক্তেরা, আর এই ফাঁক না থাকাটাই তা'রা পরম সৌভাগ্য বলে ধরে নিয়েছিলো।

যে আবহাওয়ার ছাঁচে আমার মনের কাঠামো ঢালাই হোয়েছিলো সে আবহাওয়ায় ভক্তির আবিলতা ছিলো না, শ্রদ্ধা ছিলো, কিন্তু সে শ্রদ্ধা ছিলো বিচারশীল। ভাবালুতার ফেনায় চোখ কান নাক ভরে নিয়ে সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণ করবার নির্দেশ ছিলো না সেই আবহাওয়ায়। বিচার, গ্রহণ ও বর্জন এই তিনটি খুঁটির উপরই না চিন্তার ইমারৎ রচনা। এর একটি খুঁটিও সরানো চলে না, সরালে চিন্তার ইমারৎ ধ্বসে পড়বেই। আমাদের পরিবারে পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ ছিলো। পৈতে নিতে আমার অমত জানিয়ে দিই আমার পিতাকে। তিনি যদি জোর করতেন তাহোলে আমাকে পৈতে নিতেই হোতো, কিন্তু জোর করে কাউকে কিন্তু মানাবার লোক তিনি ছিলেন না। তাঁর চরিত্রের আভিজাত্য ও উদারতা এমনই ছিলো যে কাউকে জোর করে কিছু মানাবার অশালীনতা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমি পৈতে নিই নি। আমার পৈতে না নেওয়ার পরে পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ উঠেই গেলো আমাদের পরিবারে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে ও আমাদের পরিবারে হিন্দুয়ানির গোঁড়ামী যথেষ্ট ছিলো। পৈতে নেওয়ার রেওয়াজ তার মধ্যে একটি। আমাদের বাড়ীর ছেলে মেয়েদের ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেবার কড়া অনুশাসন ছিলো। অন্য জাতের সঙ্গে বিয়ে ছিলো নিষিদ্ধ। এই সব সনাতনী রীতি বহুদিন থেকে

চলে আসছিলো আমাদের বাড়ীতে। আমার বেড়া-ভাঙ্গা মন ধাক্কা খেতে লাগলো এইসব কুৎসিত অর্থহীন নিষেধের বেড়াতে। আমার মন ফণা তুলে গর্জে উঠলো বাড়ীর এই সব সনাতনী রীতির বিরুদ্ধে। তাই হিন্দুয়ানীর জাতের গোড়ামী বাঁচানোর জন্যে গান্ধীজির প্রচেষ্টা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কোনো মতেই সম্ভব ছিলো না।

গান্ধীবাদের উপর আমার নিটোল বিশ্বাস এমনি কোরে টোল খেলো। বাস্তবের আঘাতে বিশ্বাস তুব্‌ড়ে গেলো বটে কিন্তু ভেঙ্গে যায়নি। আমার তুণে তখন কমিউনিষ্ট মতবাদ ও অনেকান্ত ভূতবাদের (ডায়লেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম্) ধোঁওয়া-নাশন তীরগুলো জোগাড় করা হয়নি। গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলো আমার সংস্কার। যে সংস্কারের ছাঁচে আমায় জীবন ঢালাই হোয়েছিলো সে সংস্কার সহজে হার-মাননেওয়ালা ছিলো না। আমার বাড়ীর সংস্কারকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি গান্ধীজির টানে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম, গান্ধীবাদ গ্রহণ করেছিলুম। আমি আগেই বলেছি যে সেই গ্রহণের মধ্যে বিচার ছিলো না, ছিলো আবেগের বাষ্প, বৃটিশ-বিদ্বেষ আর ছিলো স্বাধীনতার তৃষ্ণা।

ঘটনার পর ঘটনার আঘাত হেনে বাস্তব-রাক্ষসী যখন আমার বুকের পাঁজর ধরে ঝাঁকাতে সুরু করলো তখন সুরু হলো বিচার। যখন আন্দোলনের জোয়ার বইছিলো তখন এত মুগ্ধ ছিলো আমার মন গণ-আন্দোলনের ঢেউয়ের গর্জন শুনে যে বিচার করবার শক্তিই আমার ছিলো না। আবেগ আর দেশের প্রতি ভালোবাসার সুতো দিয়ে বোনা আমার একান্ত বিশ্বাসের দুস্থুতিকে ঘটনার তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিলো বাস্তব। তখন সেই দুস্থুতির ঠাস-বুনুনির বুক জুড়ে দেখা দিলো বহু ফুটো। তবুও গান্ধীবাদ থেকে আমার মন তখনও একেবারে সরে যায় নি। বিনামূল্যে পাওয়া আমার বংশগত সংস্কারের ধাক্কায় গান্ধীবাদকে আমার মন থেকে একেবারে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিলো না। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সংস্কারের মধ্যে অনেক কিছু ছিলো যা অমিত শক্তিশালী, অন্য দিকে তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিলো যা জমিদার পরিবারের বনেদী দুর্বলতার ক্লেদে কলুষিত। চিন্তার উদ্দেশ্য চিন্তাই, এই ভাব-বিলাসিতা ছিলো সেই সংস্কারের মধ্যে। জন সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসী আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সংস্কার শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিলো আমাদের বাড়ীতে। দু'মুখো তরোয়ালের মতো এই দু'মুখো সংস্কারের

চিন্তার দিক ও রস-সৃষ্টির দিক ছিলো খরধার আর কর্মের দিকটা ছিলো ভাব-বিলাসে মর্চে-পড়া, ভোঁতা। এই সংস্কারের বুহুনিতে চিন্তার ও কর্মের মধ্যে আত্মিক ঐক্যের অভাব থাকায় চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক যায়গায় এই সংস্কার গান্ধীবাদের অসারত্ব প্রমাণ করলেও তাকে পরাস্ত করতে সমর্থ হোলো না। আমি তখন হাত্‌ড়ে ফিরছি এমন একটি মতবাদ যে মতবাদে চিন্তার সঙ্গে কর্মের বিরোধ নেই, অসঙ্গতি নেই, আড়ি নেই।

এমনি কোরে হাত্‌ড়ে ফির্‌ছি আমি এমন সময় হঠাৎ একদিন একটি বই হাতে পড়লো। আমার ছিলো পুরাণো বইয়ের দোকানগুলোতে যাওয়ার মৌতাত। বড় ভালো লাগ্‌তো পথের ধারে দাঁড়িয়ে বইগুলো নিয়ে নাড়া চাড়া কর্‌তে। কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির পিছনে একটি পুরোণো বইয়ের দোকান দিলো। কলেজে পড়বার সময় রোজ একবার সেই দোকানে ঘুরে যেতুম। পরেও যখন ওধার দিয়ে যেতুম একবার সেই দোকানে উঁকিঝুঁকি না মেরে চলে যেতে মন সরতো না। একদিন বিকেলে এই পুরণো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি বই নজরে পড়লো। বইটির নাম— 'দি সোশালিষ্ট ফ্যালাসিজ'। একটু উল্টে পাল্টে দেখে বইটি কিনে ফেল্‌লুম। কলেজে পড়বার সময় অর্থনীতিতে ছিলো আমার ঝোঁক, ইকনমিক্‌সে অনার্স নিয়ে আমি বি. এ. পাশ করি। কলেজে নামী জাঁদরেল অধ্যাপকদের কাছে পড়েছি—কয়াজী, সেনগুপ্ত, এঁরা আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন। মার্শাল, পিয়ারসন্ প্রভৃতি যে সব অর্থ-নীতি-বিদদের বই আমরা পড়তুম সে সব বই এই ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোটিকে অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্য বলে মেনে নিয়ে এই সমাজ ব্যবস্থায় সওদার দাম, মজুরের মজুরী, জমির খাজনা, উৎপাদকের মুনাফা কি ভাবে নির্ণয় হবে সেটা আমাদের শেখাতো। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক ও সাফাই-গানেওয়ালা অর্থ-নীতিবিদ্‌দের বই পড়ে এই সমাজ-ব্যবস্থার যথার্থ উৎপাদক যারা সেই চাষী মজুরদের কি ভাবে ঠকানো হয় তা'র কোনো হদিশ আমরা পাই নি। প্রকৃতির এলাকায় যেমন দেহের আয়তনের বৈষম্য রয়েছে, সব মানুষ তো আর ছ' ফিট উঁচু নয়, কেউ বা ছ' ফিট, কেউ বা সাড়ে পাঁচ, তেম্‌নি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনী, গরীব থাকবে এটা স্বাভাবিক, এটা প্রকৃতির নিয়ম! ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই হাস্যকর সাফাই আমরা অহরহ অধ্যাপকদের মুখ থেকে শুনতুম। সোশালিজম্ আমাদের পড়ানো হোতো না আদবেই, তবে সোশালিষ্ট মতবাদের প্রহসন কোরে সেটাকে সোশালিজম্ বলে চালিয়ে দিয়ে তা'র বিরুদ্ধে

কি কি যুক্তি আছে সেইটে আমাদের শোনানো হোতো। সোশালিজমের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেওয়া হোতো তাদের মধ্যে একটি যুক্তি আজও আমার মনে আছে। যুক্তিটি ছিলো এই—সোশালিজম্ বলে ধনী শ্রেণী না থাকলে গরীবদের দুঃখ দূর হবে, তা কি কখনো হয়? হিমালয়টা গুঁড়ো কোরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিলে, পৃথিবীর উচ্চতা কতোটুকু বাড়বে? এই আষাঢ়ে যুক্তি সোশালিজমের বিরুদ্ধে চরম যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতেন আমাদের অধ্যাপকেরা! বুদ্ধির এম্‌নি মূর্তিমান ভরা-ডুবি ছিলেন আমাদের অধ্যাপকেরা আর এম্‌নি অশিক্ষার ঘানিতে জুড়ে দিয়ে আমাদের বছরের পর বছর ঘুরিয়ে মারা হোতো। আর একেই বলা হোতো শিক্ষা-ব্যবস্থা!

সোশালিজম্ সম্বন্ধে কিছুই সত্যি করে জানতুম না তখন, অধ্যাপকদের কৃপায় যেটুকু জানলুম সেটুকু হচ্ছে এই যে সোশালিজম্ একেবারে দেউলে মতবাদ, ওটা খ্যাপামি ছাড়া আর কিছু-ই নয়। ধনী গরীব থাকবেই ওটা চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব ধিক্ সোশালিজম্‌কে, শত ধিক্! যারা সোশালিজমের কথা বলে তারা ধিক্‌তো বটেই, উপরন্তু তারা নিপাত হোক্।

তবুও মনের মধ্যে অসোয়াস্তির আগুন ধিক্ ধিক্ জ্বলতেই লাগলো। অধ্যাপকেরা তাঁদের যুক্তির ভিজে ন্যাকরা জড়িয়ে এই আগুন নেবাবার যতো চেষ্টাই করুন না কেন, এ আগুন নিবোতে পারলেন না। তাঁদের যুক্তির বিরুদ্ধে খাড়া করি এমন যুক্তি আমার জ্ঞানের অস্ত্রাগারে ছিলো না সেদিন। তবুও মন মানছিলো না সেই যুক্তিগুলো। এই অত্যাচার, অনাহার ও হাহাকার এটা মানব-সমাজের চিরন্তন নিয়ম কখনোই হোতে পারে না এ কথা বার বার বলছিলো আমার মন। জ্ঞানের হাজার-মহল বাড়ীতে কতো ধরণের বিষয়-বস্তু কতো মহল জুড়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর নিজস্ব মহল আছে, তা'র অভিব্যক্তির বিশেষ নিয়মও আছে। তবুও সেই হাজার মহল বাড়ীর প্রত্যেক মহলের সঙ্গে অন্য মহলের যোগ আছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি একটি বিশেষ নিয়মে বিধৃত হোলেও সব বিষয়গুলির মধ্যে একটা যোগসূত্রও আছে। বিষয়-বস্তুগুলির টুক্‌রো টুক্‌রো আলাদা আলাদা নিয়ম-গুলোর মধ্যের এই যে যোগসূত্র এটা আসলে কি? এটা কি একটা আধিদৈবিক নির্বস্তুক যোগসূত্র? আদবেই তা নয়, এ যোগসূত্র হচ্ছে সম্পূর্ণ আধিভৌতিক মানবীয় যোগসূত্র। মানব-সমাজের কল্যাণের অখণ্ড যোগসূত্রে এই বিষয়গুলির খণ্ড জ্ঞানকে গেঁথে নেওয়াই হচ্ছে মানুষের জীবনের ব্রত।

আর এই চেতনাও মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বহু সংঘাতের ফল। তাই অর্থনৈতিক যুক্তি যদি বৈষম্যের সাফাইও গায়, বহু দুঃখ-লব্ধ মানুষের সামাজিক চেতনা তাকে অস্বীকার করবেই করবে।

'সোশালিষ্ট ফ্যালসিজ্' বইটি নিয়ে বাড়ী ফিরেই পড়তে সুরু করলুম। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমবায় সমাজ-ব্যবস্থা-স্থাপন করবার যতো স্বপ্ন মানুষ দেখেছে, কাল্পনিক সোশালিজম্ থেকে বৈজ্ঞানিক সোশালিজম্ পর্যন্ত সমস্ত মতবাদকে লেখক অসার, যুক্তিহীন প্রমাণ করবার জন্যে এই বইটি লিখেছেন। সোশালিজমের শত্রুর লেখা এই বইখানি পড়ে সোশালিজমের যথার্থতা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হলুম। সোশালিজমের স্বপক্ষের যুক্তি যেগুলো লেখক ভ্রান্ত বলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন সেগুলো আমার কাছে অকাট্য অভ্রান্ত যুক্তি বোলে মনে হোলো। সুরু করলুম সোশালিজম্ সম্বন্ধে পড়াশুনো। কি বই যে পড়বো সোশালিজম্ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কিছুই সত্যি করে জানা ছিলো না। সে দিনের কথা যখন কখনো কখনো মনে পড়ে তখন আমাদের তখনকার অবস্থা মনে করলে নিজেদের তারিফ কোরতে ইচ্ছা করে। সোশালিজম্ সম্বন্ধে কিছুই তখন জানতুম্ না, আজকের মতো জানার সুযোগও তখন ছিলো না। সোশালিজম্ সম্বন্ধে বই তখন এদেশে আস্‌তো না বল্লেই চলে। এমন কাউকে জানতুমও না যার কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্য পেতে পারি। আমরা যারা সেদিন এ পথে এসেছিলুম আমাদের মধ্যে আন্তরিকতার একটা প্রচণ্ড আবেগ ছিলো। জান্‌তেই হবে, শিখ্‌তেই হবে, নিজেদের তৈরী কর্‌তেই হবে কাজের জন্যে, এইছিলো আমাদের প্রাণের কথা। আজকে যেমন মতবাদ রেঁধে বেড়ে পরিবেশন কোরে দিলেও সেটা একটু কষ্ট কোরে তুল্লে খেতেও এ কালের ছেলেমেয়েরা রাজী নয়, আমাদের সময়ে ঠিক এর বিপরীতটা ছিলো সত্যি। জান্‌বার তৃষ্ণায় অধীর হোয়ে কি পাগলের মতো ছুটোছুটিই না করেছি আমরা, কি আকাশ পাতাল হাত্‌ড়াতেই না হয়েছে আমাদের! আমেরিকা-ফেরৎ এক আত্মীয়ের কাছ থেকে জন স্পার্গো বলে এক ভদ্রলোকের লেখা মার্কসের জীবনী পেলুম। এক নিশ্বাসে চুমুক দেওয়ার মতো কোরে পড়ে ফেললুম বইটা। সেই বইতেই পেলুম সোশালিজমের উপর কয়েকটি বইয়ের ফর্দ, মার্কসের ও এঙ্গেল্‌সের লেখা বইগুলোর তালিকা। বইয়ের দোকান, লাইব্রেরী হাত্‌ড়ে 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' যোগাড় করলুম। পড়লুম বটে কিন্তু তা'র অনেক কিছুই বুঝতে পারলুম না। চিন্তার এত

ঠাস্‌বুনি এই ছোট্ট বইটিতে যে ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি এগুলির যুত্‌সই জ্ঞান না থাকলে ওর আসল মর্মটি পুরোটা ধরা যায় না, কেমন যেন পিছলিয়ে যায়। কিছুটা কিছুটা বুঝলুম, কিছুটা কিছুটা তলিয়ে গেলো, হারিয়ে গেলো। এই সময়ে রুশীয় বিপ্লব সম্বন্ধে লেখা প্রাইসের বইটা হাতে এলো। হাতে এলো আর একটি বই, নাম তা'র 'নারী ও রাজনীতি'। ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির সঙ্গে এই বই-ই ঘটালো আমার প্রথম পরিচয়। আমার মন একেবারে বেঁকে বস্‌লো, কিছুতেই সে রাজী নয় এই নীতি মান্‌তে। মন রেগে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, বল্‌লো—এও কি কখনো সম্ভব যে মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ঘটেছে ও ঘট্‌ছে তা' সবই অর্থনৈতিক কারণে ঘটেছে? এ কখনই হোতে পারে না, এ নীতি মানুষকে চার পায়ে হাঁটাতে চায়, সেটি কখনো হতে দেবো না, সেটা কখনো সত্যি নয়। বইটার কথা মান্‌তে পারছি নে অথচ বইটা ছাড়তেও পারছি নে। বার বার বইটা পড়লুম আর প্রত্যেকবারই মন ভীষণ রাগ করে চেঁচায়, ভড়কে দেয় আমাকে। রক্তের সঙ্গে মিশে-যাওয়া ধোঁওয়াশ্রয়ী 'আধ্যাত্মিক' সংস্কার যে এই নীতির ধাক্কা খেয়ে এ রকম কোরে চেঁচাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সংস্কার রেগে বুকের মধ্যে আঁচড়াতে লাগলো, বল্‌লে ফিস্‌ফাস্ কোরে—ভগবানকে তুমি মানো না অনেকদিন তা' জানি, কিন্তু তাই বলে মানুষের 'আত্মা' 'আধ্যাত্মিক দৃষ্টি' 'আদর্শানুরক্তি' এগুলোকে কি তুমি মানো না? শুধু স্বার্থের খাতিরে; অর্থনৈতিক চাবুকের তাড়নার মানুষ তা'র সামাজিক ইতিহাস তৈরী কোরে আস্‌ছে এতো দিন, এই কথা তুমি বলতে চাও? চুপ কোরে রইলুম, আমি নিজেই তখন অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি, তীর পাচ্ছি না, অন্যকে বল্‌বোই বা কি, বোঝাবোই বা কি! পরে যখন ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির যথার্থ ধারণা করতে পারলুম তখন বুঝলুম যে দুর্বুদ্ধি শত্রুর চেয়ে নির্বুদ্ধি মিত্র কম ভয়ঙ্কর নয়। দুর্বুদ্ধি শত্রুর চেয়ে কমিউনিষ্ট মতবাদের কম ক্ষতি করে নি নির্বুদ্ধি মিত্র। জ্ঞানের অভাবে কমিউনিজমের যান্ত্রিক বিশ্লেষণ কোরে তা'রা কমিউনিজম্‌কে বিকৃত রূপে ধরে দিয়েছে লোকের সামনে। আমার ভাগ্য দোষে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতির সঙ্গে আমার পরিচয় এই নীতির এম্‌নি একটি কাঠ-কাঠ যান্ত্রিক বিশ্লেষণ মারফৎ। কমিউনিজম্ কিম্বা ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-নীতি একথা কখনো বলে না যে একমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে মানুষ সব কিছু করছে কিম্বা ইতিহাসের ধারার মূল হচ্ছে

নিছক অর্থনৈতিক মূল। এই বিকৃত ধারণার জন্য দায়ী কমিউনিজমের শত্রুদের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার আর কমিউনিজমের নির্বুদ্ধি বন্ধুদের কাঠ-মোল্লাগিরি।

কমিউনিজমের সঙ্গে আমার পরিচয় যখন সবে সুরু হয়েছে তখন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীতে রাশিয়া থেকে সদ্যপ্রত্যাগত শিবনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হোয়ে গেলো একদিন। বিচিত্রা-ভবনে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় তাঁর ঘর থেকে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ বের হয়ে এলেন। অপ্রত্যাশিত দেখার মতোই হোলো আমাদের অপ্রত্যাশিত আলাপ। শুনলুম তাঁর কাছে তিনি আফগানিস্থান হোয়ে রাশিয়ায় গিয়াছিলেন, সেখানে এক বৎসর থাকবার পর ইয়োরোপে হোয়ে দেশে ফিরেছেন সম্প্রতি। তখুনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালুম যতো শীঘ্রি সম্ভব একদিন আস্‌তে। শিবনাথ এলো, তা'র কাছ থেকে কোঁচড় ভরে কুড়লুম রাশিয়ার খবর। শিবনাথ লেনিনকে দেখেছিলো, তাঁর বক্তৃতাও শুনেছিলো সে। ওর কথা শুনে মনে হোতে লাগ্‌লো যে এতদিনে বুঝি একজন লোক পেলুম যে বন্ধ দরজা খুলে নতুন জগতে প্রবেশ করবার মন্ত্র জানে। একদিন কথায় কথায় তার সঙ্গে তর্ক বেধে গেলো। অসহযোগ আন্দোলনের ও গান্ধীজির তীব্র সমালোচনা সুরু করলো সে, আমি কেন জানি না সহ্য করতে পারলুম না তা'র সমালোচনা। কথার বাণ কাটাকাটি চল্‌লো, আমাদের দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষন। তর্কের বিষয় ও কথা কাটাকাটি ঝাপ্‌সা হোয়ে গেছে মনে। তবু গান্ধীবাদের সমর্থনে আমি যে তর্ক করেছিলুম তা'র থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে গান্ধীবাদের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ তখনো আমি ছিন্ন কোরে উঠ্‌তে পারি নি। তখনো আমার মনের মধ্যে নতুন পথ জেগে ওঠে নি, শুধু তা'র সম্ভাবনার ইসারা পাচ্ছিলুম আমি মনের মধ্যে। শিবনাথের কাছেই আমার রুশীয় ভাষা শেখবার হাতে খড়ি হোলো। খুব অল্পদিন তা'র কাছে পড়েছিলুম কিন্তু তবুও অন্তত এ বিষয়ে সে আমার গুরুগিরি করেছে একথা মানতেই হবে। শিবনাথের পথ আর আমার পথ বহুদিন থেকে একেবারে ভিন্নমুখিন। পথে চলার সময় আমরা দু'জনে দুজনকে মিষ্টি কথা পরিবেশন করি নি ও আদবেই রেহাই দিই নি, আর সেটা স্বাভাবিকও, বিশেষ করে যখন আমরা দুজনেই যা ধরি তা' সারা মন দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরি। তবু সংঘাতের ধূলো ঝড় তোল্‌বার পর আবার যখন থিতিয়ে যায় পথের উপর,

তখন চব্বিশ বছর আগের দিন মনে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে রাগের ধূলোও থিতিয়ে যায় মনে। আমার নিজের কথাই বলছি, কেন না শিবনাথের মনের খবর আমার জানা নেই।

কমিউনিজম্ সম্বন্ধে নানা বই পড়তে পড়তে শ্রেণী-সংঘাতের অর্থ আমার কাছে সুস্পষ্ট হোয়ে এলো, বুঝলুম তখন বিপ্লবের মানে কি আর বিপ্লবের-শক্তিই বা কোথা থেকে আসে। এতোদিনে 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'র প্রতিপাদ্য বিষয় আমি ঠিক মতো বুঝতে পারলুম। শ্রেণী-সংঘাতের অপর নামই যে রাজনীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস যে আসলে শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাস সেটা আমার কাছে পরিস্কার হোয়ে গেলো। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যে একটি শ্রেণী বিশেষের দল, শুধু সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করা ও স্বার্থ পুষ্ট করাই যে সেই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, এটা যখন বুঝতে পারলুম তখন গান্ধীবাদের আর কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিস্কার হোয়ে গেলো। গান্ধীবাদের উপর বিশ্বাস হারালেও এতোদিন সংশয়ের অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছিলো আমার মন। এবার সে পৌঁছলো গিয়ে কূলে। সবল পায়ে নিঃসংশয় মনে সোজা হোয়ে দাঁড়ালুম আমি কমিউনিজমের তীর-ভূমিতে। গান্ধীবাদের সঙ্গে আমার চিরকালের জন্যে ছাড়াছাড়ি হোয়ে গেলো।

এমন সময় একদিন ডাক এলো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে আমার বর্ণদিদির কাছে থেকে। তাঁর দক্ষিণে যাবার সখ হোয়েছে, আমার উপর হুকুম হোলো তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। তীরে পৌঁছবার জন্যে নিজের সঙ্গে এতোদিন যে লড়াই কোরে আসছিলুম তা'তে ক্লান্তি কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন কোরেছিলো আমাকে। দক্ষিণে যাবার সম্ভাবনা ঘটায় খুসি হলুম। নতুন পথে যাত্রা সুরু করবার আগে শরীর ও মন আলো বাতাসে ধুয়ে নেবার দরকার ছিলো। কতো ঘোরাই ঘুরলুম সেবার বর্ণদি আর আমি! ওয়ালটিয়ার, মাদ্রাজ, মহাবলিপুরম্ তাঞ্জোর, মাদুরা, ত্রিচিনোপলি, রামেশ্বরম্, সব ঘুরে ছিলুম সেবারে দু'জনে। মহাবলিপুরম্ যে কি ভালো লেগেছিলো তা বলে শেষ করতে পারি নে। লোকের বাস নেই বল্লেই হয়, দূরে জেলেদের গ্রাম, সেখান থেকে তা'রা আসে মহাবলিপুরমে। মন্দিরের পুরোহিত, লাইট্-হাউসের লোক আর জেলেরা, এ ছাড়া জনমনিষ্যি নেই সেখানে। কয়েকটি মন্দির সমুদ্র লুকিয়ে নিয়েছে ঢেউয়ের আঁচলের তলায়। তীরের উপর বালির

আলিঙ্গনে বন্দী ছোট্ট একটি মন্দির। জোয়ারের সময় ঢেউয়ের হাত বাড়িয়ে দেয় সমুদ্র মন্দিরটিকে স্পর্শ করবার আগ্রহে। তীরের উপর পাইনের বন, যেন সমুদ্রের নীল ঢেউয়ের সঙ্গে রেশারেশি কোরে পৃথিবী সবুজ ঢেউ তুলেছে তীরের বুকে। মনে হয় যেন কতো শতাব্দীর স্বপ্ন এই মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে। সারারাত আমি ঘুমোইনি, নির্জন বালির পথে চাঁদের আলোতে ঘুরে বেড়িয়েছি। এমন একটা স্বপ্নভরা জায়গা আমি আর দেখিনি কোথাও। এখানে এলে বর্ত্তমানের সব থেই হারিয়ে ফেলে মানুষ। তারপরেও দু'বার আমি মহাবালিপুরমে গেছি আর দু'বারই আমার মনে হোয়েছে যেন আমি বর্তমানের সঙ্গে সব সম্পর্ক-হারা কাহিনীর অবাস্তব-পুরে এসে হাজির হোয়েছি।

দক্ষিণের মন্দিরগুলো স্থাপত্য কলার অপূর্ব নিদর্শন। গোপুরম্ থেকে মন্দিরের গর্ভগৃহে যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, সে পর্যন্ত প্রত্যেকটি সৃষ্টি একই মূল ভাবের সূত্রে গাঁথা। গোপুরম দিয়ে ঢুকেই বিরাট প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গণের মধ্যে শিবের ষাঁড়ের প্রস্তর মূর্তি। তারপরে কয়েকটি ধাপ উঠে আর একটি প্রাঙ্গন, তারপর নাটমন্দির, তারপরে অন্ধকার গর্ভগৃহ যেখানে বিগ্রহ বিরাজমান। দীর্ঘপথ অতিক্রম কোরে ধাপের পর ধাপ উঠে মানুষ পৌঁছয় গিয়ে সেই অন্ধকার ঘরে যেখানে ভগবান আছেন। এই ভাবটিকেই মূর্তি দেবার জন্যে মন্দিরগুলি এই ভাবে তৈরী করা হয়েছে। বিরাট মন্দিরগুলোর অটল গাম্ভীর্য মনকে অভিভূত করে। স্থাপত্য কলার নিদর্শন হিসেবে মন্দিরগুলো যতই ভালো লাগুক না কেন, মাদুরা তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপলি প্রভৃতি সহরগুলো যেন ধর্মের শিক দিয়ে তৈরী দম-বন্ধ-করা খাঁচা। সে যে কি এক অসহ্য আবহাওয়া এই সহরগুলোর! মন্দিরগুলো যেন থাবা দিয়ে মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে চেপে রেখে দিয়েছে সংস্কারের পাথরের তলায়। ছেলে বুড়ো সবার কপালেই ফোঁটা, সবাই চলেছে মন্দিরের দিকে। মন্দিরে যাওয়া ছাড়া যেন আর কোন কাজ নেই। জীবনকে এরা যেন একেবারে সঁপে দিয়েছে মন্দিরের হাতে। ধর্মের এই অসহ্য গুমোটে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো, মন্দিরগুলো দেখে কলকাতায় ফিরে এসে বাঁচলুম।

একদিন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্কোয়ার মুখো চলেছি, হ্যারিসন রোড আর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের কোণে ফিরিওয়ালাদের হাতে একটি নতুন কাগজ নজরে পড়লো। পত্রিকাটির নাম 'লাঙল'। নতুন ধরণের নামটি লাগলো

ভালো। পত্রিকাটি নিয়ে বাড়ী ফিরলুম, পড়ে দেখলুম যে শ্রমিক-কৃষকদলের নাম দিয়ে একটি দল সৃষ্টি হোয়েছে, সেই দলেরই মুখপত্র হচ্ছে 'লাঙল'। তখুনি চিঠি লিখলুম 'লাঙলের' অফিসের ঠিকানায়। দলের তরফ থেকে শ্যামসুদ্দীন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা কোরতে জোড়াসাঁকোয় এলেন। তা'র দু'তিন দিন বাদেই আমি হাজির হলুম গিয়ে 'লাঙ্গলে'র আফিসে। ৩৭ নং হ্যারিসন রোডে একটি মেসের দোতলায় দু'টি ঘর নিয়ে শ্রমিক-কৃষকদলের ও 'লাঙলে'র আফিস ছিলো। মনে আছে সেই বিকেল্ বেলাটা। আমি গিয়ে হাজির হলুম সেখানে। তখন আমার খালি পা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরণে খদ্দর। ঘরের মধ্যে একটি ছোট্ট মানুষ বসেছিলেন, শরীর তাঁর কৃশ, মুখ বিবর্ণ। শামসুদ্দীন সাহেব আলাপ করিয়ে দিয়ে বল্লেন ইনি হচ্ছে মুজফ্ফর্ আহমেদ। পাশের ঘর থেকে লম্বা রোগা একজন বেরিয়ে এলেন। আলাপ হলো, শুনলুম তাঁর নাম নলিনী গুপ্ত। একটি অল্পবয়সী ছেলে সেখানে বসেছিলো, শামসুদ্দীন আলাপ করিয়ে দিয়ে বল্লেন—এ আমার ছোট ভাই, হালিম। প্রথম দিন মুজফ্ফ্রের সঙ্গে আলাপ হোলো। শ্রমিক-কৃষক দলের সম্বন্ধে আলোচনা করলুম দু'জনে। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত তখন এই দলের সভাপতি, অতুল গুপ্ত সহ-সভাপতি আর হেমন্ত সরকার জেনারেল সেক্রেটারী। স্বরাজ পার্টির তখন নাভিশ্বাস উঠেছে, দেশবন্ধু চলে গেছেন, তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তক্ত-তাউস দখল করবার জন্যে তখন নখদন্তের খুব জোরালো ব্যবহার চলেছে। সেই সময় হেমন্ত সরকার শ্রমিককৃষক দলে যোগদান করেন। দু তিন দিন বাদে আবার গেলুম 'লাঙল' অফিসে, সেদিন হেমন্ত সরকার আর নজরুল ইস্লাম এই দু'জনের সঙ্গে আলাপ হোলো সেখানে। হেমন্ত সরকার ছিলেন দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্য, তাঁর দক্ষিণ হস্ত বল্লেও চলে। যেমন ছিলো তাঁর খর-ধার বুদ্ধি, তেম্নি বলবার ক্ষমতা, তেম্নি রাজনৈতিক চালবাজীর পটুত্ব। এখনকার হেমন্ত সরকারকে দেখে সেদিনকার হেমন্ত সরকারের কোন ধারণাই কেউ করতে পারবে না। নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেলো। সে কবিতা পড়লো, গান গেয়ে শোনালে। আমিও তাকে গান শোনালুম। কি ভালোই লেগেছিলো নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে! সবল শরীর; ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটি যেন পেয়ালা, কখনো সে পেয়ালা খালি নেই, প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর। গলাটি সারসের গলার মতো পাৎলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিৎ তেম্নি, সবল, বীর্য-ব্যঞ্জক। গলার স্বরটি ছিলো ভারী, গলায় যে

সুর খেলতো খুব বেশী তা বল্তে পারি নে, কিন্তু সেই মোটা গলার সুরে যাদু ছিলো। ঢেউয়ের আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপ্টার মতো তা'র গান আছ্ড়ে পড়তো শ্রোতার বুকে। অনেক চিকণ গলার গাইয়ের চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষগুণ ভালো লাগতো। আমি তাকে ঠাট্টা কোরে বলতুম—অমন কাংসবিনিন্দিত সুরে গান নাইবা গাইলে নজরুল? সে দু'হাত দিয়ে তার গলাটিকে বেড়ে ধরে হেসে বলতো—কেন? এতোখানি গলা রয়েছে, তবু তুমি আমাকে গান গাইতে মানা করছো? এই বলে হা হা কোরে হেসে উঠ্তো। প্রাণ ছিলো তা'র ঐ হাসির মতোই সরল প্রবল ও দরাজ। এক ধরণের লোক আছে তাদের চেহারা কথাবার্তা হাবভাব সব ফ্যাকাশে। গোধূলির করুণ রঙে নিজেদের জাহির করবার তাদের কি অশ্রান্ত চেষ্টা। এইটেই নাকি কবি ও ভাবুকের ট্রেডমার্ক! ড্রইংরুমে আর মেয়েমহলে এই ট্রেডমার্ক থাকলে নাকি খাতির অবশ্যম্ভাবী! এই অসহ্য মুখ-মেরে-দেওয়া মিঠে ভাব নজরুলের আদবেই ছিলো না। প্রবল হোতে সে ভয় পেতোনা, নিজেকে মিঠে দেখাবার জন্যে সে কখনো চেষ্টা করতো না। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসেনি বাঙলা দেশে। এমন সহজ-গতি, আবেগের আগুন-ভরা কবিতা বাঙলা সাহিত্যে বিরল। সত্যেন দত্তের কবিতা এর তুলনায় আড়ষ্ট। একটি কৃত্রিম ছন্দ-সচেতনতা সব সময়েই রসাস্বদনে বাধা ঘটায় সত্যেন দত্তের কবিতায়। মনে হয় ভাবটিকে সচেতন ভাবে ছন্দের সাজ পরাণো হয়েছে। নজরুলের কবিতায় কৃত্রিমতার দুর্গন্ধ আদবেই নেই, মনের হিমাদ্রি থেকে ভাবের জমাট বরফ কল্পনার সূর্যালোকে গলে নেমে এসেছে দুর্বার ধারায়। ভাব নিজের ছন্দ নিজেই তৈরী কোরে নেমে এসেছে, ছন্দ সৃষ্টি করবার জন্যে তাকে প্রয়াস কোরতে হয় নি। 'লাঙলে' বের হোলো নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। একদিনের মধ্যে 'লাঙল' সব বিক্রি হয়ে গেলো, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপ্তে হোলো। নজরুলের কবিতাই ছিলো 'লাঙলের প্রধান আকর্ষণ। যে সব প্রবন্ধ ছাপা হোতো সেগুলোর মধ্যে কমিউনিষ্ট মতবাদের ছোঁওয়া কিছু কিছু থাকলেও উগ্র জাতীয়তাবাদেই ঠাসা থাকতো প্রবন্ধগুলি। তাছাড়া কাঁচা মনের ছাপও কম থাকতো না লেখা-গুলোতে। চালকেরা যে কি রকম কাঁচা ছিলেন তার একটি মজার উদাহরণ দিই। শ্রমিক-কৃষকদলের মুখপত্রে সুভাষচন্দ্রের কোষ্ঠীর ফলাফল-বিচার ছাপানো হয়েছিলো! আন্তরিকতা ছাড়া আমাদের সত্যি কোরে আর কোনো

সম্বল ছিলো না সে দিন। আমি যোগ দিলুম এই দলে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'লাঙলে'র জন্যে আশীর্বচন যোগাড় করবার ভার পড়লো আমার উপর। এক দিন সকাল বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পেশ করলুম আমাদের আর্জি। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন—

"জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভাঙ্গা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।"

'লাঙলে'র প্রচ্ছদপটে তাঁর আশীর্বচন থাকতো। এর কিছুদিন পরে আমরা পত্রিকার নাম বদল কোরে তা'র নাম রাখলুম 'গণবাণী'। মুজফ্‌ফর্ হোলেন পত্রিকার সম্পাদক। এই 'গণবাণী'তেই আমি 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফোষ্টো'র অনুবাদ ছাপাই। উনিশশো ছাব্বিশ সাল গড়িয়ে এলো। স্থির হোলো দলের প্রথম কনফারেন্স কৃষ্ণনগরে করা হবে। কলকাতা থেকে মুজফ্‌ফর, ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত, কুতুবদ্দীন আহম্মদ ও আমি কৃষ্ণনগরে গেলুম। হেমন্ত ও নজরুল তখন কৃষ্ণনগরেই থাকতেন। কন্‌ফারেন্সের জন্যে গান লেখবার ফরমাস করা গেলো নজরুলকে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে আদায় করলুম আমরা দুটি গান—'ধ্বংস-পথের যাত্রীদল', আর 'ওঠ্‌রে চাষী জগৎবাসী ধর্ কসে লাঙল।' বাঙলা সাহিত্যে এই ধরণের গান ছিলো না এর আগে, নজরুলই তা'র পথকার। কৃষ্ণনগর সেদিন মৌচাকের মতো মুখর। শুধু যে আমাদের শ্রমিক-কৃষকদলের কন্‌ফারেন্স হচ্ছিলো তা নয়, সেই একই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স ডাকা হোয়েছিলো কৃষ্ণনগরে। সরোজিনী নাইডু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন শাসমল প্রভৃতি কংগ্রেসী নেতারা সবাই সেবার হাজির কৃষ্ণনগর কন্‌ফারেন্সে। আমাদের কন্‌ফারেন্স হোলো কৃষ্ণনগর টাউন হলে আর জনসভা টাউন হলের মাঠে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স হোলো কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে।

ইতিহাস এখানেও রসিকতা করতে ছাড়লো না। রাজবাড়ীতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের দিকে আঙুল দিয়ে কংগ্রেসের আসল রূপ দেখিয়ে দিলো সকলকে। সকালবেলা আমাদের কনফারেন্স সুরু হোলো। দলের গঠনতান্ত্রিক নিয়মাবলী ও কর্মসূচী গৃহীত হোলো এই কন্‌ফারেন্সে। অতুল গুপ্ত দলের সভাপতি নির্বাচিত হোলেন। বিকেলবেলা টাউনহলের মাঠে জনসভা সুরু হোলো নরেশ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে। তাঁর আর

অতুল গুপ্তের কলকাতা ফেরার জরুরী দরকার ছিলো বলে নরেশবাবু আমাকে সভার সভাপতি কোরে দিয়ে চলে গেলেন। জনসভায় সেই আমার প্রথম আবির্ভাব। আমার যা অবস্থা! ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনি লাগে কোথায় আমার কাঁপুনির কাছে! চেয়ারে বসে আছি মনে হচ্ছিলো যেন চেয়ার থেকে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবো মাটিতে। মিটিংএ বলা দূরে থাকুক, ইস্কুলে পড়বার সময় ইস্কুলের তর্ক-সভায় কিছু বলতে আমার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত শুকিয়ে যেতো। ইস্কুলে যখন পড়ি তখন আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়তো। তার নাম সুবোধ দাসগুপ্ত। সুবোধ কোমরে হাত দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে খুব নাটকীয় ধরণে বক্তৃতা করতো। আমি অবাক হোয়ে তার বক্তৃতা শুনতুম আর ভাবতুম এও কি সম্ভব! কি অসাধারণ ক্ষমতা সুবোধের, আমার মুখে একটি কথা যোগায় না আর সুবোধ কিনা অনর্গল বক্তৃতা করে যায়! আমি তর্ক-সভায় বক্তৃতা করতে উঠ্‌লেই মাথার মধ্যে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে এমনি মনে হোতো। যা বলবো বলে ঠিক করেছিলুম সব যেতুম ভুলে, মাথার মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা, বুড়োর হাতের লাঠির মতো সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ কোরে কেঁপে অস্থির আর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরগুলোর উপর বার বার আছড়ে পড়তো, মনে হোতো যেন পাঁজরগুলো ঠেলে ঠুলে হৃৎপিণ্ডটা বাইরে ঠিক্‌রে পড়বে। আমি যে কখনো সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারবো এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কৃষ্ণনগরের মাঠে আমার সেই প্রথম বক্তৃতার কথা আমি কখনো ভুলবো না। কি যে দু' কথা বলেছিলুম তা আমার আদবেই মনে নেই। তবে আমার অবস্থা দেখে বোধ হয় শ্রোতাদের করুণা হয়েছিলো। চারদিক থেকে 'গান গান' ধ্বনি উঠ্‌লো, আমিও বাঁচলুম। দু'টি গান গেয়ে কোন মতে নিজের প্রাণ রক্ষে কোরে বসে পড়লুম। নজরুলও সেই মিটিংএ ছিলো, সে বক্তৃতাও দিলো, গানও গাইলো। কনফারেন্সের কাজ শেষ হোলে আমি আর কুতুবদ্দীন নবদ্বীপ দেখ্‌তে গেলুম। কুতুবদ্দীনকে ধুতি চাদর পরিয়ে নিয়ে গেলুম, কি জানি নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের রক্ত যদি মুসলমানকে দেখে গরম হোয়ে ওঠে! ললিতা সখির নাম অনেকদিন থেকে শুনে আস্‌ছিলুম, তাঁকে দেখবার কৌতূহল ছিলো মনে। আমি কুতুবকে নিয়ে তাঁর আস্তানায় হাজির হলুম গিয়ে। বারণ্ডায় বসে আছি কিছুক্ষণ এমন সময়ে শাড়ী-পরিহিতা একটি স্থূলকায় লোক এসে আমাদের সামনে বসলেন।

অঙ্গে কাঁচুলি ও শাড়ী, হাতে চুড়ি, চুল মেয়েদের মতো করে কপালের দু' পাশে পাতা কাটা। হাতের কব্জি চওড়া, বাহু দুটি আর যাই হোক মৃণাল বলে ভ্রম হবার কোনো উপায় নেই। আগেই শুনেছিলুম যে ললিতা সখী হবার আগে তিনি কুস্তি কোরতেন আর ললিতা সখী হবার পরেও একবার দাঙ্গার সময়ে লাঠি হাতে রাস্তায় নেমে বহু লোকের মোহড়া নিয়েছিলেন। বাহুদুটি দেখে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার অবকাশ রইলো না। কুতুবকে নির্বাক হোয়ে বসে থাকতে বোলে আমি শুরু করলুম আলাপ ললিতা সখীর সঙ্গে। শুধালুম তাঁকে যে তাঁর ললিতা সখী নাম নেওয়ার অর্থ কি এই যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ললিতা সখীর যে সম্বন্ধ ছিলো তিনি নিজের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুরাগের বন্ধন অন্তরে অনুভব করেন? তিনি বল্লেন যে ঠিক তাই, তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই সখিভাব অনুভব করেন। বল্লুম যে তা'র জন্যে শাড়ী পড়বার প্রয়োজন ছিলো কি? যেটা অন্তরের অনুভূতি তা'কে এ ধরণের বাহ্যিক রূপ দেবার দরকার কি ছিলো? ললিতা সখি বল্লেন—আমি ছেলেমানুষ, আমি কি জানি, আমার গুরুকে জিজ্ঞেস করুন। এর পর যে প্রশ্নই করি না কেন এই একই জবাব তিনি দিতে লাগলেন। বুঝলুম আমার প্রশ্নের তাড়ায় খোলের মধ্যে মাথাটি ঢুকিয়ে নিয়েছেন ভদ্রলোক, আর জবাব পাওয়া যাবে না।

কলকাতায় ফিরে এলুম। দলের ভাণ্ডে লক্ষ্মীর পদ্মের পাঁপ্‌ড়ির টুকরোও কোনো অনুকূল বাতাসে পড়ে না উড়ে এসে। দম্‌কা হাওয়ার মতো আসে যায় 'গণবাণী'। মুজফ্‌ফর নলিনীদের ভরা পেট থাওয়া খুব কমই জোটে, অনাহারের পালা লেগেই আছে প্রতি মাসে। আমার হাতেও টাকা নেই কিছু। সহকর্মীদের উপবাস, কাজের ক্ষতি, আমাকে অস্থির কোরে তুললো। হঠাৎ মাথায় এলো গানের আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহ কোর্‌লে তো হয়! উঠে পড়ে লেগে গেলুম তোড়জোড়ের কাজে। এলবার্ট হলে 'বসন্ত উৎসব' অনুষ্ঠিত হোলো। নজ্‌রুল ইস্‌লাম, নলিনীকান্ত সরকার ও আরো অনেকে গান গাইলেন। আমিও ছিলুম সেই গায়কদের মধ্যে। যৎসামান্য হোলেও কিছু টাকা এলো, অনাহার ও উপবাসের হাত থেকে কিছুদিনের মতো রেহাই পেলো মুজফ্‌ফরেরা। 'গণবাণী' আবার দেখা দিলো রাস্তার মোড়ে। তা'র অল্প দিন পরেই নানা ঋতুর গানের ফুল গেঁথে নিয়ে তৈরী করলুম সুরের মালা। তা'র নাম দিলুম 'ঋতুচক্র'। এবারে গানের

আসর বস্‌লো ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। হলের উপর নীচ ভরে গেলো লোকে। দেড় হাজারের চেয়েও বেশী টাকা পেয়েছিলুম সেবার। ঋতুচক্রের কথা মনে হোলেই মনে পড়ে রেবার নাচ। আমাদের দলের মধ্যেও কেউ জান্‌তো না যে রেবা নাচবে সেদিন সন্ধ্যের আসরে। রেবার বাবার অনুমতি চাইতেই তিনি দিয়ে দিলেন। এমনি উদার ও নির্ভীক লোক ছিলেন রেবার বাবা। কোন গানের সঙ্গে রেবা নাচবে সেটা ঠিক করে নিলুম রেবাতে আমাতে। উৎসবের শেষ গান—'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে'—সুরু হোতেই রেবা গানের দল থেকে বের হোয়ে এলো উল্কার মতো ষ্টেজের মাঝখানে, গানের হাল্‌কা ছন্দের সঙ্গে সুরু কোরে দিলো চপল নৃত্য। প্রকাশ্যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বাঙলা দেশে রেবার আগে কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে নৃত্য করেনি। রবীন্দ্রনাথও তখন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের দিয়ে নৃত্য অনুষ্ঠান করান নি। এর প্রায় বছরখানেক বাদে 'নটীর পূজা'য় রবীন্দ্রনাথ নৃত্যর অবতারণা করেন। এ বিষয়ে রেবা পথকারিণী। সেই সর্বপ্রথমে পথ দেখিয়েছে। এর জন্যে তাকে কম বিদ্রূপ ও অপমান সহ্য করতে হয়নি। অনুষ্ঠানের পরেই 'সঞ্জীবনী' থেকে শুরু কোরে সব সংবাদপত্রগুলি আমার ও রেবার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার সুরু কোরে দিলো। তার উত্তর স্বরূপ আমি আবার একটি নৃত্যগীতের আসর করলুম। এবার উৎসব হোলো আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাঙ্গনে। 'নূপুর বেজে যায় রিণি ঝিণি' এই গানটির সঙ্গে নাচ্‌লো চিত্রা, নন্দিতা আর সুমিতা। নীতি-বাগীশদের কাঠমোল্লাইগিরির উত্তর দিলুম আমি সেদিন এমনি কোরে। নৃত্যের অনুষ্ঠান একটির পর একটি কোরে আমি এদের ধাক্কা দিয়ে যাবো এই ছিলো আমার সঙ্কল্প। তার স্বল্পকাল বাদে রঙ্গমঞ্চে ভদ্রঘরের মেয়েদের নৃত্যের প্রবর্ত্তন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নীতিবাগীশদের দাপট ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হোয়ে মিলিয়ে গেলো তাদের মনের ভীরু অন্ধকারের মধ্যে।

ছোট্ট আমাদের দলটি মতবাদও তার উগ্র জাতীয়তাবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তবুও কংগ্রেসী নেতাদের বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার অন্ত ছিলো না। সেই প্রবল বিরুদ্ধতা উপেক্ষা কোরে আমরা ক'টি লোক একটি নতুন সামজিক আদর্শ প্রচারের কাজে লেগে গিয়েছিলুম। কুষ্টিয়া সহরে একটি কন্‌ফারেন্স হোলো। বহু জেলে সেই সভায় যোগদান করলো। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সেই কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। নজরুল, হেমন্ত সরকার ও আমি যোগদান করেছিলুম সেই

কনফারেন্সে। টেরারিষ্ট দলগুলির উপর বীতশ্রদ্ধ হোয়ে কিছু লোক এই সময়ে আমাদের দলের দিকে সরে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কোরে দলের মধ্যে তাঁদের টেনে নেওয়া হয়। এই সময় বাঙলা দেশের বিভিন্ন টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করবার মতলব আমার মাথায় আসে। চট্টগ্রাম, নদীয়া, ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলুম, উদ্দেশ্য ছিলো এই সব দলগুলির সাহচর্যে একটি কেন্দ্রিয় সংগঠন গড়া। টেরারিষ্ট দলগুলির পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এতো অসম্ভব রকম বেশী ছিলো যে আমার চেষ্টা দলীয় ঈর্ষার পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে পড়লো। তবুও এই পরিচয়ের ফলে টেরারিষ্টদলগুলি থেকে কিছু লোককে আমাদের দিকে টেনে আনবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলুম।

শ্রমিক-কৃষক দল গঠন করবার উদ্দেশ্য ছিলো মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে টেরারিজম্ ও কংগ্রেসের আওতা থেকে সরিয়ে গণ-অন্দোলনের জোয়ারের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া। দেশের তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা যা ছিলো তাতে স্বাধীনতার তৃষা-কাতর মধ্যবিত্তকে কংগ্রেসের মরীচিকার মায়া থেকে বাঁচিয়ে বিপ্লবের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে নিয়ে আসবার পথে শ্রমিক-কৃষক দল ছিলো প্রথম সরাইখানা। আমরা অন্তত শ্রমিক-কৃষক দলকে এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসেবে দেখেছিলুম। বিপ্লবের আসল হাতিয়ার —কমিউনিষ্ট দল—তৈয়ারীর দিকে আমাদের পুরো নজরই ছিলো। শ্রমিক-কৃষক দলের রাজনৈতিক আবরণের তলায় কমিউনিষ্ট দল গঠন করবো এই ছিলো আমাদের সংকল্প। আমরা করেছিলুমও তাই। বোম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, রাজপুতনা এ সব জায়গায় দু'একটি কোরে লোক ছিলো যারা কাণপুর কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র কেসের পরে কমিউনিজমের কাছে ঘেঁসে এসেছিলো। মুজফ্ফর, নলিনী, ডাঙ্গে, ওসমানী এঁরা সকলেই সেই প্রথম কমিউনিষ্ট-ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও সবাই দীর্ঘ মেয়াদের পর মুক্তি পেয়েছিলেন। এঁরা তো ছিলেনই, আরো কিছু নতুন লোক এসে আমাদের সঙ্গে জোটে। এই নতুন লোকদের মধ্যে ছিলো একজন তার নাম ছিলো বাগরহট্টা। কলকাতায় এসে বাগরহট্টা জোড়াসাঁকোয় আমার ওখানে ওঠে। তার কথা শুনলে মনে হোতো যে বিপ্লবের আর আদবেই দেরী নেই! ঝাঁকে ঝাঁকে কমিউনিষ্ট-পঙ্গপাল উড়ে এসে ক্যাপিটালিস্টদের মুনফাধর্মী সমাজের ক্ষেত উজাড় কোরে দিলো বলে! তার উৎসাহের প্রবল ধাক্কায় বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলা আমার

পক্ষে অসম্ভব হোয়ে উঠেছিলো। কিছুদিন কলকাতায় থেকে বাগরহট্টা তার মুলুকে ফিরে গেলো। তার কিছুদিন পরে আমাদের কাছে বাগরহট্টা সম্বন্ধে যে খবর পৌঁছলো তার থেকে বুঝতে পারলুম যে তখনকার গভর্মেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগের রজতবারিধারার সিঞ্চনে বাগরহট্টায় প্রবল উৎসাহের তরু মঞ্জুরিত হয়েছিলো।

ইউরোপের সঙ্গে আমাদের যোগ ছিলো তখন পণ্ডিচেরীর রাস্তা দিয়ে। আর সেই যোগ কতোটুকুই বা ছিলো! কচিৎ কখনো মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি এসে পৌঁছতো আর সেই চিঠি পাঠ করতুম আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। রায়ের লেখা দু' একটি পুস্তিকা আর তার চিঠি এই ছিলো আমাদের সম্বল। আমরা তখন আশ্চর্য রকম কাঁচা ছিলুম, কিন্তু আমাদের একটা সৌভাগ্য ছিলো; কমিউনিজম সম্বন্ধে নিজেদের স্বল্প জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত সচেতন ছিলুম। আর এই সচেতনাই নির্বুদ্ধিতার অপঘাত মৃত্যু থেকে আমাদের বাঁচিয়েছিলো। এ যুগের আধুনিকেরা যে উৎকট কাঁচা-পাকামি রোগে অহরহ ভুগে থাকে সেই সর্বনেশে নির্লজ্জ রোগে আমরা কখনো ভুগি নি।

হঠাৎ একদিন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়ে গেলো। কিছুকাল অন্তর অন্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া ছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বজন বিদিত নীতি। ধর্মের দোহাই দিয়ে, সম্প্রদায়ের নামে মানুষ যে কি রকম আচম্‌কা পশু বনে যেতে পারে তা' দেখলুম। শুনলুম মুসলমান চাকর পঁচিশ বছর হিন্দু মনিবের ওখানে কাজ করবার পর মনিবকে খুন করলো নিজের সম্প্রদায়ের লোক ডেকে এনে। শুনলুম মাড়োয়ারী ধনী তার ত্রিশ বছরের পুরোনো মুসলমান কোচোয়ানকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করলো। বহুকাল থেকে আবদুল ভিস্তি আমাদের বাড়ীতে কাজ করতো। মশকে জল ভরে ড্রেন নর্দমা ধোলাই করা ছিলো তা'র কাজ। বুড়ো আবদুল রোজ সকালে আসতো। মশকের মুখ খুলে হাত দিয়ে চিপে ধরে তা'র জল ছিটানোর কায়দা দেখতে ভারী ভালো লাগতো। আমার উপর তা'র স্নেহ ছিলো, আমাকে দেখলেই তা'র মুখ হাসিতে কুঁকড়ে যেতো। আমাকে সে মাঝে মাঝে মশকের মুখ চিপে ধরে জল ছিটোতে দিতো। তার খাটুনি বাড়্‌তো, আবার তাকে ভরতে হোতো মশক, তবু সে খুসি মনে মিটতো আমার আব্‌দার। দাঙ্গার সময় একদিন সকালে আব্‌দুল এসে মাটিতে আছড়ে পড়লো। পাড়ার সব লোক অনেক কাল থেকে তা'কে জানতো। তবুও সেদিন রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীর

সামনের রাস্তা দিয়ে সে যখন আমাদের বাড়ীতে আসছিলো, তখন হিন্দুরা তাকে ধরে দুটো কানের কিছু অংশ কেটে নিয়েছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ে তার কাঁচাপাকা দাড়িকে রাঙিয়ে দিয়েছে। আব্দুলের কান্না শুনে দৌড়ে এলুম নীচে। যা শুনলুম তাতে দুঃখে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হোলো। বুড়ো আব্দুল, পল্লীর প্রতিটি লোকের চেনা সে, রাস্তায় কত লোক তা'র সঙ্গে হেসে কথা কইতো। আজ হঠাৎ এতোদিনের পরিচয় সব ভেঙে চুড়মার হোয়ে গেলো চীনে মাটির বাসনের মতো! সাম্প্রদায়িক হানাহানি আব্দুলের আর সব পরিচয় লোপ করে দিলো নিমেষে, শুধু একটি মাত্র পরিচয় তা'র রয়ে গেলো যে সে মুসলমান! তার কান ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে, লোক সঙ্গে দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম। দিনরাত হল্লার আওয়াজ আসে, বিশেষ কোরে নিঝুম রাত্তিরে। একদিন দুপুরে ভীষণ হল্লা উঠ্‌লো আমাদের বাগানের পাঁচিলের ও ধারে সিংহী বাগানে। ত্রিশ চল্লিশজন মুসলমান হিন্দুদের তাড়া খেয়ে পাঁচিল টপ্‌কে লাফিয়ে পড়েছে আমাদের ভিতর বাড়ীর বাগানে। দরোয়ানরা লাঠি হাতে দৌড়লো তাদের মারবার জন্যে। দরওয়ানদের ধমকে সরিয়ে দিয়ে আমি তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে বসালুম আমাদের একতলার বারাণ্ডায়। বাগানের পাঁচিলের ওদিকে তখন ভীষণ হল্লা সুরু হোয়েছে। গিয়ে দেখি প্রায় দু' তিন শো লোক জড়ো হোয়েছে। আমাকে দেখে চিৎকার সুরু হোলো—মুসলমানদের বের করে দাও নইলে আমরা জোর কোরে বাড়ীতে ঢুকবো। হাতের বন্ধুকটা দেখিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকলে তাদের কি অবস্থা হবে। কিছুক্ষণ হট্টগোল করে তা'রা সব চলে গেলো। আনজুমানকে টেলিফোন কোরে গাড়ী আনিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিলুম। তার দুদিন বাদে 'হানিফীতে' বের হোলো যে ঠাকুর বাড়ীর সৌম্যেন্দ্রনাথ অনেক মুসলমানকে বাড়ীতে আটক কোরে ফেলেছিলো, নেহাৎ খোদাতাল্লার কৃপা ছিলো বলে এই মুসলমানেরা অনেক কৌশল কোরে তা'র হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে। 'হানিফীর' সম্পাদক আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের অফিসে মাঝে মাঝে আসতেন। পরে দেখা হোতেই জিজ্ঞেস করলুম তাঁকে যে আমার সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাঁর কাগজে সেই খবরটি কোথা থেকে জোগাড় হোলো! তিনি হেসে বল্লেন আনজুমান খবর দিলো আপনি অনেক কটি মুসলমানকে বাঁচিয়েছেন। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে বলেও দিলো যে খবরটিকে বিকৃত কোরে কাগজে বের কোরতে, তাই কোরেছি ব্যবসার খাতিরে। অবাক হোয়ে

শুনলুম তাঁর কথা। ব্যবসার খাতিরে জঘন্য মিথ্যে সত্য হোয়ে গেলো! আর সেই মিথ্যে পরিবেশন করা হোলো হাজার হাজার লোককে, তাদের মনে ঢেলে দেওয়া হোলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ, সব শুধু ব্যবসার খাতিরে! কি চমৎকার সমাজ-ব্যবস্থাতেই না আমরা বাস করছি! গণবাণীর এক বিশেষ সংখ্যা বের করলুম এই সময়ে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উপর লিখলুম আমি আর মুজফ্‌ফর। একদিন বিকেলে ৩৭ নং হ্যারিসন রোডে দলের অফিসে বসে আছি এমন সময় রাস্তা থেকে চীৎকার শোনা যেতে লাগলো—কালী মাইকি জয়। বারাণ্ডায় বের হোয়ে দেখি একদল কলেজের ছেলে হকি ষ্টিক, লাঠি, খাটের পায়া, যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে চলেছে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের দিকে। নেমে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলুম তা'রা চলেছে কোথায়। শুনলুম ঠনঠনে কালীবাড়ী মুসলমানেরা আক্রমণ করবে খবর এসেছে। তা'রা সেই কালীবাড়ী রক্ষে করবার জন্যে চলেছে। বল্লুম কালীবাড়ী রক্ষে করুক ভালো কথা, কিন্তু এই জঘন্য খুনোখুনি বন্ধ করবার কোনো উপায় তা'রা ভেবেছে কি? তা'রা শুধোলে—আপনি কি বলেন? বল্লুম,—হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ছেলেদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরী করা দরকার। তা'রা রাস্তায় রাস্তায় পাহাড়া দেবে আর গুণ্ডা, খুনী অত্যাচারীদের কঠোর ভাবে দমন করবে। এছাড়া এই দাঙ্গা বন্ধ করবার কোন উপায় নেই। তা'রা শুনলে আমার কথা, কিন্তু উত্তরে বল্লে যে ও সব কথা শোনবার সময় এখন নয়। আগে মুসলমানদের সায়েস্তা করা যাক, পরে ও সব কথা ভাবা যাবে। 'জয় মা কালী,' 'কালী মাইকী জয়' চিৎকার কোরতে কোরতে তা'রা চলে গেলো। মাস খানেক ধরে এই বীভৎসতার স্রোত বইলো কলকাতার রাস্তাগুলিতে। লর্ড লিটনের গভর্মেণ্ট কিছুই কোরলো না, পুলিশও কোনো রকম বাধা দিলো না দাঙ্গাকারীদের। লর্ড লিটন দার্জিলিংয়ের তোফা আরাম ছেড়ে কলকাতায় নেমে এলেন না। একমাস দাঙ্গা চলবার পরে তিনি কলকাতায় এলেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে দেখা হোলো। মিস ম্যাকলাউড আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি থাকতেন বেলুড় মঠে, আমি প্রায়ই যেতুম তাঁর কাছে। কথায় কথায় বল্লুম তাঁকে গভর্মেণ্টের উদাসীনতার কথা, শত শত লোক প্রাণ হারাচ্ছে দাঙ্গায়, আর লর্ড লিটন দার্জিলিংয়ে বসে বরফের হাওয়া খাচ্ছেন। তিনি বল্লেন তুমি একবার লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা কোরে সবটা বল না কেন তাঁকে। বল্লুম—লর্ড লিটনের

সঙ্গে দেখা কোরে কি হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি তিনি, তা'রাই তো এই দাঙ্গা লাগাচ্ছে। তাদের এজেন্টের সঙ্গে দেখা কোরে লাভ কি? মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে লর্ড লিটনের খুব ভাব ছিলো। বেলুড়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে লিটনের দেখার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি চুপ কোরে রইলেন; কিছু বললেন না। কয়েকদিন বাদে লর্ড লিটনের সেক্রেটারীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলুম, আপনি যদি অমুক দিন এসে গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করেন তো তিনি খুসি হবেন। আমার ইচ্ছে ছিলোনা, তাই লিখে পাঠালুম আমি কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি এখন দেখা করার সুবিধে হবে না কয়েকদিন বাদে আবার একটা চিঠি এলো লিটন সাহেবের সেক্রেটারীর কাছ থেকে। সেদিন দুপুরে খালি পায়ে খদ্দর গায়ে হাজির হলুম গিয়ে গর্ভমেণ্ট হাউসে। লর্ড লিটনের সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা হোলো। বল্লেম তাঁকে, অন্য সময় পুলিশের জুলুমের অন্ত থাকেনা আর এখন দরকারের সময় পুলিশ কেমন নিস্ক্রিয়, তাদের সামনে হত্যা চলেছে তারা দাঁড়িয়ে দেখছে। তিনি চুপ কোরে সব শুনলেন, শেষে বল্লেন, পুলিশের সম্বন্ধে আপনার মত আমি মানতে পারলুম না। সে তো জানাই ছিলো যে সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট লর্ড লিটন এটা মানতে পারবেন না। ইচ্ছে কোরলে তো দু' ঘণ্টার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ কোরে দিতে পারতেন তিনি, তিনিই তো এই দাঙ্গাকে এক-মাসের উপর চল্‌তে দিলেন। এখন কোন মুখে তিনি তাঁর নিজের কুকর্মের নিন্দে করেন! পর দিন বেলুড়ে গিয়ে মিস ম্যাকলাউডকে জানালুম সব। যেমন হঠাৎ সুরু হোয়েছিলো একদিন, তেমনি হঠাৎ একদিন দাঙ্গা বন্ধ হোয়ে গেলো। বোঝা গেলো উস্‌কানেওয়ালা ও দাঙ্গা-লাগানেওয়াদের মনোস্কাম পূর্ণ হয়েছে। হিন্দু মুসলমান এক হোয়ে চলছিলো, এখন তাদের ভাগ কোরে দেওয়া হোলো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কাঁটার বেড়া তুলে।

একদিন সকালে নলিনী এলো জোড়াসাঁকোয় বললে বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে একজন কমরেড প্রায় দু' মাস হোলো কলকাতায় এসেছে। এ দু মাস সে আমাদের সঙ্গে দেখা করে নি, শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিলো। এখন সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার পরের দিন বৃটিশ কমরেডটিকে সঙ্গে নিয়ে নলিনী এলো জোড়াসাঁকোয়। শুনলুম কমরেডটির নাম ক্যাম্বেল। ক্যাম্বেল বল্লে যে পুলিশের নজর এড়াবার জন্যই

সে এই দু মাস আমাদের সঙ্গে দেখা করেনি। এই দু মাস সে কিশোরী ঘোষ, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নিছক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছে। প্রায় রোজই ক্যাম্‌বেল জোড়াসাঁকোয় আস্‌তো। বাগানের ধারের আমার একতলার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের আলোচনা চল্‌তো। ইংলণ্ডে তখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যালঘুদের আন্দোলন (মাইনরিটি মুভ্‌মেণ্ট) চালাচ্ছিলো বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি। সেই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিলো ক্যাম্‌বেল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কিছু জানলুম ও শিখলুম তা'র কাছ থেকে। বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কি উপায়ে আমরা যোগাযোগ রাখতে পারি সে বিষয়েও আমাদের আলাপ হোলো কিছুদিন। হঠাৎ একদিন সকালে নলিনী হন্তদন্ত হোয়ে ছুটে এলো আমার কাছে। শুনলুম ক্যাম্‌বেল্ সকালে গ্রেপ্তার হোয়েছে তার বাড়ী থেকে, আমাদের আফিসও খানাতল্লাসী করেছে পুলিশ। আমি আর নলিনী গেলুম ব্যাংকশাল ষ্ট্রীটের ফৌজদারী আদালতে। আমি জামিন হোয়ে ক্যাম্‌বেলকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম। ক্যাম্‌বেলের কাছে শুনলুম যে ভাটপাড়ার চটকল মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী কালিদাস ভট্টাচার্যের কাছে সে তার পাসপোর্ট রেখেছিলো। ভাটপাড়ার ইউনিয়নের আফিস তল্লাসী কোরে পুলিশ পেয়েছে সেই পাসপোর্টটি আর জাল পাসপোর্ট নিয়ে ভারতবর্ষে আসার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তার আসল নাম ক্যাম্‌বেল নয়, এলিসন, সেটাও জানলুম তখন। তারপরেও এলিসন প্রায় মাসখানেক কলকাতায় ছিলো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুলিশের মোটর তার পেছনে পেছনে ঘুরতো, সে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে দেখবার জন্যে। আমরা দুজন প্রায়ই একসঙ্গে বের হতুম আর পুলিশের চরেরা ছুটতো আমাদের পিছু পিছু। অনেকবার আমরা চরদের চোখে ধূলো দিয়ে সরে পড়েছি দুজনে। দেখতুম আমাদের খুঁজে হয়রান হোয়ে ছোটাছুটি করছে চরের দল। একদিন দুপুরে এলো এলিসন, আমার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে খুব হাসতে সুরু করে দিলে।

যা শুনলুম তাতে আমারও হাসি চাপা দায় হোলো। এ্যালিসনের পেছন পেছন পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়ালো জোড়াসাঁকের গলির সামনে। চর দু'টি এ্যালিসনকে গলিতে ঢুকতে দেখে নিশ্চিন্ত হোয়ে চোখ বুজেছে। এ্যালিসন অমনি ঘুরে গিয়ে তাদের গায়ের কম্বল দুটো ধরে দিলে টান। ঘুম গেলো ভেঙ্গে, ঝিমুনি গেল থেমে, তা'রা দু'জনেই মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে

ছুট, কম্বল দুটো নিয়ে চলে এলো এ্যালিসন। ট্রফি হিসেবে কম্বলদুটি দেখাতুম সকলকে। পরে আমার বুড়ো টেরিয়ার ফ্যাক্‌সির বিছানায় পুলিশের কম্বলের সদ্ব্যবহার হোলো। মাসখানেক বাদে এলিসনকে বম্বে নিয়ে গেলো। দু'বছর জেলে থাকার পর তাকে নির্বাসিত করলো ভারতবর্ষ থেকে। মস্কোয় আর বার্লিনে তার সঙ্গে আমার ফের দেখা হোয়েছিল।

'কালিকলম' গোষ্ঠির মধ্যে আমাকে টেনে আন্‌লো আমার বন্ধু সুবোধ রায়। গল্প-লেখক ও সমালোচক হিসেবে সে সুখ্যাতি পেয়েছিলো রসিক সমাজে। কর্ণওয়ালিশ মার্কেটের দোতলায় ছিলো 'বরদা এজেন্সী'। এই বইয়ের দোকানের সত্বাধিকারী শিশিরবাবুর আর্থিক সাহায্যে মাসিক পত্রিকা 'কালিকলম' জন্মলাভ করে। প্রেমেন মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু আর সুবোধ রায় এই চারজন তরুণ সাহিত্যিকের যৌথ সম্পাদনায় পত্রিকাটি বের হয়। শালের উল্টো পিঠটার মতো জীবনের যে দিকটা সেলাই-বের-করা সে দিক্‌টার ছবি সর্বপ্রথম এঁরাই এঁকে ধরেন সবার সামনে। সমাজের নীচের তলার লোকদের জীবনের কাছে ঘেঁসে এসে, নিবিড় ভাবে সেই জীবনকে দেখে ও অনুভব করে এঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তাঁর চারিত্রিক হোলো রিয়ালিজম্। কি অপূর্ব গল্প আর কবিতাই না সে সময়ে লিখেছিলেন প্রেমেন মিত্র আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজানন্দ তাঁর প্রতিভাকে তখনো মজুরো খাটাবার কাজে লাগান নি। এমনি আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে সত্যিকার কলাবিদ্ একে তো অতি বিরল, এলো একজন প্রতিভাবান গল্প-লেখক সে এমনি কোরে আত্মহত্যা করলো। নজরুলও লিখতো 'কালিকলম' পত্রিকায়। সিন্ধু নামে তার দুটি অপূর্ব কবিতা এই সময় ছাপা হয় 'কালিকলমে'। আমি লিখলুম 'নরনারী' নামে দু'টি প্রবন্ধ। হাওড়ায় সাহিত্যসভায় পঠিত 'সাহিত্য' প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হোলো। স্বরচিত গান ও কেন্দুলী মেলায় যে সব বাউলের গান সংগ্রহ কোরেছিলুম তাও কিছু কিছু ছাপালুম। 'বরদা এজেন্সীর' সামনের ছাদে আমাদের বৈঠক বসতো। সুবোধ, প্রেমেন, শৈলজানন্দ, নজরুল, মুরলীধর ও আমি আলাপ-আলোচনায় গানে গল্পে মসগুল হোয়ে কতো সন্ধ্যা কাটিয়ে দিয়েছি সেখানে। আমার 'নরনারী' প্রবন্ধ দু'টি খেপিয়ে দিলো নীতিবাগীশদের। সমালোচনার যে ছুরি দিয়ে এঁরা আমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করতে চেষ্টা করলেন, সে ছুরি ছিলো অসম্ভব ভোঁতা। তাই নিছক ব্যথা দিলো এদের সমালোচনা, বিঁধতে পারলো

না আমাকে। আমার 'সাহিত্য' প্রবন্ধটি খেপিয়ে দিলো বন্ধু নজরুলকে। এই প্রবন্ধে সাহিত্যিক রস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুলের দু'একটি কবিতার স্থূলতা, মাংস-বহুলতা ও রস-বিকৃতির সমালোচনা করেছিলুম। কবিতা যে দেহের এ্যানাটমি শেখাবার জন্যে নয়, ওর জন্যে যে মেডিকেল কলেজে যাওয়াই প্রশস্ত, এই শ্লেষটুকু ছিলো আমার সমালোচনায়। নজরুল উঠ্‌লো ক্ষেপে, আমাকে ব্রাহ্ম বলে বিদ্রূপ সুরু করলে। একদিন সন্ধ্যে বেলা আমাদের সেই ছাদের মজলিশে ছিলুম আমি, সুবোধ আর নজরুল। আর কে কে ছিলেন তা' ঠিক মনে নেই।

নজরুলের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক বেধে গেলো। রসের সংযম সে মানতে রাজী ছিলো না। রসের সংযমকে সে নীতিবাগীশের আনুষ্ঠানিক সংযমের নামান্তর মাত্র বলে তর্ক করতে লাগলো। রসের গাদ বাদ দেওয়া যে রসেরই খাতিরে আর রস-সৃষ্টির জন্যে যে সেটার একান্ত দরকার, এটা সে কিছুতেই মান্‌তে রাজী হোলোনা। এই স্থূলতাই শেষ পর্যন্ত নজরুলের কবিতার সমাধি রচলো। বিশ্ব-সাহিত্যের কথা দূরে থাক, নিজের দেশের সাহিত্যের খবরও সে খুবই কম রাখতো। একবার প্রায় জোর করে বল্লেই হয় রবীন্দ্রনাথ তাকে কালিদাসের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। মনের ইন্‌টেলেকচুয়াল পরিধি খুব সংকীর্ণ হওয়াতে কবিত্বের তরু বিচিত্র উপাদানের মধ্যে শিকড় মেলে দিতে পারল না। একটু গভীরে গিয়েই সে ধাক্কা খেলো অজ্ঞানতার পাথরে।

ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসবার পরে একদিন চলেছি হেঁটে বিবেকানন্দ রোড দিয়ে। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ফিরে দেখি নজরুল। অবাক্ হোয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। চুল তৈল-মসৃণ, গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, পরণে চিকণ ধুতি, হাতে আংটি। বিশ্বাস করা শক্ত ছিলো যে এ নজরুল। হায়রে, বজ্র পরলো বাবুর সাজ, ভুললো তার গুরু গম্ভীর গর্জন, সুরু করলো নকল করতে কিনা নূপুরের ধ্বনি! ঝড় কিনা সাজলো ঝালর-দেওয়া টানা পাখার সাজে! ভুললো কিনা সে দিগন্তের কপোল স্পর্শ করবার তৃষ্ণা ড্রইংরুমচারিণীদের কপোল পরশ করবার লোভে! আমাকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে নজরুল বল্‌লে—কেন তাকিয়ে আছো অমন কোরে? বল্লুম, এই দেখা না হলেই ছিলো ভালো। যে নজরুলকে আমি জান্‌তুম, ভালো বাসতুম, যে নজরুল ছিলো আমার বন্ধু,

সে এ নয়। এ নজরুল গ্রামফোন কোম্পানীর গোলামীর তক্‌মা পড়েছে চোখে মুখে সর্বাঙ্গে। বাজারে কদর হোক না কেন তার গানের, বেশীর ভাগ গান শ্যাওলার মতো ভাস্‌ছে জলের উপরে, মনের গভীরতাকে স্পর্শ ই করেনা। লক্ষ্মীর পাণ্ডাদের বায়নার জালে সরস্বতীর পূজারী যদি ধরা দেয় তা'হোলে তার এই অবস্থাই হয়। তাকে মনে করিয়ে দিলুম বহুকাল আগের এক সকালের কথা। সেদিন সকালে আমি আর নজরুল দুজনে গিয়েছিলেম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তার স্বরচিত গান শোনাতে বল্লেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল গাইলো 'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংস-পথের যাত্রীদল' আর 'শিকল পরা ছল'। রবীন্দ্রনাথ খুসী হলেন গান শুনে। নজরুল চলে যাবার পর আমাকে বল্লেন—নজরুলের নিজস্ব একটি জোরালো ধরণ আছে। সেদিন দু'চারটি কথার পর নজরুলকে বল্লেন—শুন্‌ছি তুমি নাকি মন যোগানো লেখা লিখতে সুরু করেছো? বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচবার জন্যে? রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি নিয়ে নজরুল একটি কবিতা লিখেছিলো। তার কবিতা প্রমাণ করলো যে সে রবীন্দ্রনাথের কথার অর্থ ধরতে পারেনি। তার পরে আর একবার মাত্র দেখা হোলো নজরুলের সঙ্গে। হেমন্ত সরকার নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাকে আর নজরুলকে তাঁর বাড়ীতে। গল্প হোলো, গানও হোলো কিন্তু দুজনেই বুঝলুম যে সুরু আমাদের আলাদা হোয়ে গেছে, মিলছে না কোথাও। সেই আগেকার দিনের মজলিশের কথা মনে পড়লো। কতো জায়গায় নলিনীকান্ত সরকার, নজরুল আর আমি গান গেয়েছি। কতো দুপুর, কতো সন্ধ্যে কাটিয়েছি আমরা গানে গল্পে মশগুল হোয়ে। সে দিনের সুরের খেই একেবারে হারিয়ে গিয়েছিলো। আমাদের সেই শেষ দেখা। এতো বড় শক্তিমান কবি, এতো সে দিয়েছে দেশকে আর তা'র কিনা ভালো করে চিকিৎসা হোলোনা অর্থের অভাবে! এমন একজন ডাক্তার জুটলো না এই দেশে যে নজরুলের চিকিৎসা করবে অর্থের খাতিরে নয়, নজরুল যা দিয়েছে আমাদের তারি জন্যে ভালোবাসার কৃতজ্ঞতায়। চল্‌তে চল্‌তে 'কালি কলম' থেমে গেলো এক দিন অর্থাভাবে। তবুও স্বল্প-আয়ু এই পত্রিকা একটি তার জুড়ে দিয়ে গেলো বঙ্গ-সাহিত্য-বীণাপাণির বীণায়, যার সুর পরবর্ত্তী কালে সাহিত্যিকদের সৃষ্টির পথ দেখিয়েছে। এই সময়ে একবার হাওড়ায় সাহিত্য সভায় আমার ডাক পড়লো। দীনেশচন্দ্র সেন

মহাশয় ছিলেন সেই সভার সভাপতি! আমি পাঠ করলুম সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ। 'কালিকলম' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটিই ছাপা হোয়েছিলো। দীনেশ সেন মহাশয় সে দিন আমাকে তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করলেন। মহাকবি কালিদাসের সমালোচনা করবার ধৃষ্টতা রাখে কিনা এক যুবক! এই ছিলো তার বক্তব্যের সারাংশ। তিনি আমাকে শিশুকাল থেকে দেখেছেন সে বিষয়েও অনেক কিছু শোনালেন। শুধু আমার বক্তব্যের খণ্ডনে কি যুক্তি আছে সেটা কাউকে জান্‌তে দিলেন না। আজও আমি কালিদাস সম্বন্ধে সেই একই মত পোষন করি। অপরূপ বর্ণনা আছে তাঁর কাব্যে, কিন্তু বেশীর ভাগ কবিতায় মাংস নিয়ে এতো বেশী ঘাঁটাঘাঁটি আছে যে মনকে পীড়া দেয় সে মাথামাখি, তৃপ্তি দেয় না। দেহ ও মনের মধ্যে রসের অনির্বচনীয় সেতু রচনা করতে পারেন নি মহাকবি, 'ঋতুসংহারে' তো নয়ই এমন কি 'মেঘদূতেও' নয়। খুব অল্পই কবিতা আছে যাতে রসের সিঞ্চনে দেহ মন হোয়ে গেছে অনুভূতির অনির্বচনীয় লোকে।

আমার দিনগুনি তখন এম্‌নি কোরেই কেটেছে। গান, সাহিত্য, বাঁশী, রাজনীতি, সব নিয়েই আমি তখন ভরপুর। আমার প্রাণশক্তি ছিলো অপর্যাপ্ত, অন্তরের নিঃস্বতার ক্লান্তি আমি কখনো অনুভব করিনি। বাগানের ধারের আমার একতলার দক্ষিণের ঘরে দিন রাত আনাগোনা চল্‌তো বন্ধু বান্ধবদের। কতো ধরণের লোক আস্‌তো, রাজনীতির বন্ধুরা, সাহিত্যের সাথীরা, গানের দোসরেরা। আমার গানের মজলিস ছিলো তখন রেবা, লীলা প্রভৃতি বন্ধুদের বাড়ীতে আর আমার পিস্‌তুতো ভাই দাদা মহীমোহনের ওখানে। বৌঠাকরুণ ছিলেন মজলিসী লোক, হাসিখুসি মানুষটি। আমাদের অনেক উৎপাত সইতেন, নিজে হাতে রেঁধে আমাদের খাওয়াতে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। তাঁর তেতলার ছাদে বসতো আমাদের গানের আসর। কৃষ্ণচূড়ো গাছটির লাল ফুল ছুঁতো এসে ছাদের কোন, যেন গান শোনার কৌতূহলে সে ঝুঁকে রয়েছে ছাদের দিকে। বিকেলের শেষ আলো মিলয়ে যেতো সন্ধ্যার আবছায়ায়, সন্ধ্যা তারা জ্বল্‌জ্বল্ করতো আকাশে। আমি গানের পর গান গেয়ে যেতুম সুরের নেশায় ভরপুর হোয়ে। সে আসরের নিত্য সাথী ছিলেন বড় বৌঠাকরুণ আর মেজ বৌঠাকরুণ। মাঝে মাঝে আসতেন দাদা মহীমোহন আর তিলোত্তমা।

সেবার ভাদ্রমাসে আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাঙ্গনে হোলো 'শেষ বর্ষন'। লাল বাড়ীতে (বিচিত্রা ভবনে) থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঘরের

পাশে বিরাট কদমগাছ ফুলে ফুলে ভর্তি। প্রতিদিন নতুন গান তৈরী হচ্ছে। দিনের মধ্যে কতোবার দৌড়ে আস্‌তো তাঁর ভৃত্য বনমালী আমাকে তলব্ করতে। তাঁর কাছ থেকে গানগুলো শিখে নিয়ে অন্যদের শিখিয়ে দিতুম। এই সময় একটি মুসলমান ওস্তাদের কাছে আমি শিক্ষা করছিলুম দরবারী সঙ্গীত। কয়েকটি সুর লাগলো ভালো, শোনালুম সেই গানগুলো রবীন্দ্রনাথকে। সেই সুরগুলির ছাঁচে ঢেলে তিনি তৈরী করলেন—'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে বাজে'; 'কার বাঁশী নিশি ভোরে বাজিলো' আর 'বন্ধু রহ রহ সাথে।' একদিন গভর্মেণ্ট হাউস থেকে সংবাদ এলো বেলজিয়ামের রাজ এলবার্ট ও তাঁর রাণী কলকাতায় এসেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গীতানুষ্ঠান দেখতে আস্‌তে চান। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিমন্ত্রন করলেন 'শেষ বর্ষণে'র একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। সে দিনকার উৎসবে আমি যোগ দিলুম না। রাজা রাণী আর লাটসাহেবকে গান শোনাবো আমি! কাকা রথীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকে বল্লেন যে সে দিনকার অনুষ্ঠানে আমার যোগদান না করাটা ভালো দেখাবেনা। আমার আপত্তির কারণ তাঁকে জানিয়ে দুপুর থেকেই আমি বাড়ী থেকে বের হোয়ে গেলুম। অনেক রাতে যখন বাড়ী ফিরলুম তখন এলবার্ট ও তাঁর রাণী চলে গেছেন, উৎসব শেষ হোয়ে গেছে। 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন সুরু হোলো বাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে আমি আমি জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করি। তাঁর ইচ্ছে ছিলো যে তিনি নিজে নেবেন রঘুপতির ভূমিকা। তিনি নিজে আমাকে তালিম দিয়েছিলেন কয়েকদিন। পরে বনেদী পরিবারের পারিবারিক জীবনে ঈর্ষার যে পঙ্কিল স্রোত বয় সেই স্রোত মুখর হোলো আমাকে ঘিরে। আমি সরে দাঁড়ালুম। রবীন্দ্রনাথ নিজে নিলেন জয়সিংহের ভূমিকা আর দিনেন্দ্রনাথ রঘুপতির। অভিনয়ের দিক থেকে বিসর্জন আমার মনে বিশেষ কোনো দাগ রেখে যায় নি। রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের আর গুণবতীর ভূমিকায় আমার কাকী সংজ্ঞা দেবীর অভিনয় হোয়েছিলো অনবদ্য। জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় আমার বিশেষ ভালো লাগেনি। তিন দিন অভিনয় হোয়েছিলো এম্পায়ার থিয়েটারে আর তিন দিনই আমি আটক ছিলুম ষ্টেজের মধ্যে। অভিনেতাদের কথার খেই ধরিয়ে দেবার ভার ছিলো আমার।

টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা আমি আগেই বলেছি। ঢাকায় গিয়ে শ্রীসঙ্ঘের অনিল রায়, লীলা নাগ (বর্ত্তমানে লীলা রায়)

ও অন্য অন্য দলের লোকদের সঙ্গে আমি দেখা করি। ডাঃ ভূপাল বসু তখন ঢাকাতেই আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও আমার দেখা হলো। কলকাতায় তখন টেগার্টের অপ্রতিহত দাপট। তা'কে সরাবার জন্য নানা দলের নানা প্রচেষ্টা চলেছে। আমি নিজে টেরারিষ্ট দলভুক্ত কখনো ছিলুম না। কিন্তু এই দলগুলির বহু কর্মীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা ছিলো। তাই এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যখন বল্লে যে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আমার একতলার ঘরে আমি যদি ওদের বোমা তৈরী করতে দিই তাহোলে তাদের কাজের খুব সুবিধে হয়, আমি রাজী হলুম। রবীন্দ্রনাথ কিম্বা আমার পিতা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন যে তাঁদের বাড়ীতে বোমা তৈরী করা হচ্ছে টেগার্টকে মারবার জন্যে! কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে জিনিষপত্তর সঞ্চিত হোলো আমার ঘরে। বুড়ো হরিচরণ অনেক কাল থেকে আমাদের বাড়ীতে ফরমাস মাফিক পিতলের নানা জিনিষ তৈরী কোরে দিতো। তাকে দিয়ে পিতল ঢালাই করিয়ে বোমার খোল তৈরী করিয়ে দিলুম ছেলেদের।

রাত্তির বেলা দু'তিনটি ছেলে এসে হাজির হোতো, এটা ওটা মিশিয়ে তা'রা তৈরী করতো বোমা, আমি সাহায্য করতুম সাধ্যমত। ঘরের মেজেতে আর আমাদের হাতে লাগলো হল্‌দে ছাপ। বারুদের গন্ধ ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসকে এমন করে জড়িয়ে ধরলো যেন সেই নাছোড়বান্দা গন্ধ ঘর ছেড়ে যেতে রাজী নয়। এ্যালিসন তখনো কলকাতায়, সেও ঘরের কোণে ইজিচেয়ারটিতে হেলান দিয়ে বসে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখতো। এমনি কোরে কিছু কিছু জিনিস তৈরী হেলো, বাড়ী থেকে চলেও গেলো তৈরী জিনিসগুলো। জাহাজের একটি লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলুম একজন বন্ধু মারফৎ। তার কাছ থেকে রিভলবার সংগ্রহ কোরে যোগান দিলুম এই ছেলেদের। টেগার্টকে মারবার জন্যে যে দল যা কিছু সাহায্য চেয়েছে আমি তাই দিয়েছি তখন। রোজ রাত্তিরে ছেলেরা আসতো জোড়াসাঁকোয়, নিষুতি রাতে বোমা তৈরীর কাজ সুরু হতো। একদিন রাত্তিরে ঘরে আমরা তিন চারজন। বোমা তৈরীর কাজ সুরু হোয়ে গেছে, ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। তখন রাত প্রায় দশটা। এমন সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো নলিনী, বল্লে, হ্যারিসন রোডে আমাদের দলের অফিস থানাতল্লাসী করছে পুলিশ, সেখান থেকে জোড়াসাঁকোয় আসবার খুবই সম্ভাবনা আছে। মুহূর্তের জন্য মনে হোল যেন শরীর অবশ হোয়ে গেছে। এতো রাত্তির, এতো জিনিষপত্তর চারিদিকে ছড়ানো, এখন করি কি! তখুনি

দারোয়ানকে দিয়ে ট্যাক্‌সি ডাকিয়ে ট্যাক্‌সিতে সব জিনিসপত্তর উঠিয়ে ষ্ট্রাণ্ডের দিকে গঙ্গার ধারে চলে গেলুম। চলন্ত ট্যাক্‌সি থেকেই সব জিনিষপত্তর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম গঙ্গার দিকে। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এলুম। পুলিশ কিন্তু এলো না সে রাত্তিরে। এলে কিন্তু রক্ষে ছিলো না, আমাদের হাত আর ঘরের মেজে সাক্ষী দিতো আমাদের বিরুদ্ধে।

এই সময়ে আমার আলাপ হয় সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে। সন্তোষ তখন কিছুটা ঘেঁসে এসেছে আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের দিকে। যুগান্তর দল থেকে বের হোয়ে এসে সে তখন নিজের একটি দল তৈরী করেছে। সংগঠন করবার ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কূটনীতির দক্ষতা সন্তোষের ছিলো। সুভাষচন্দ্র ও যতীন সেনগুপ্তর মধ্যে তখন নেতৃত্ব নিয়ে যে লড়াই চলছিলো তাতে সে ছিলো সেনগুপ্তর পক্ষে। সন্তোষ প্রায়ই আস্‌তো জোড়াসাঁকোয়, সঙ্গে আস্‌তো তার বন্ধু ও সহকর্মী ধীরেন। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় ধীরেন প্রাণ হারায় কলকাতার রাস্তায়। সন্তোষ তখনো ব্যক্তিমূলক সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসবান ছিলো। আমি তাকে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলুম তখন। অর্থের অভাবে সব দলগুলিই পঙ্গু হোয়ে ছিলো আর অর্থ ছাড়া অস্ত্র যোগার করা সম্ভব ছিলো না। অর্থ যোগার করবার নানা ফন্দি আঁটতে লাগলো সন্তোষ। একদিন এসে বল্লে যে সে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জুটিয়েছে। আমি সই করে নিলে সে টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। বল্লুম, আমার সইতে সে দেবে কেন? ঠাকুরদাদা, পিতা সবাই রয়েছেন, আমার তো কোনো অধিকারই নেই সম্পত্তিতে। সন্তোষ বল্‌লে যে জোড়াসাঁকো বাড়ী দেখিয়ে লোকটির কাছ থেকে টাকা ধার করা শক্ত হবেনা। মনে খট্‌কা থাকলেও আমি রাজী হলুম। একদিন সকালে সন্তোষ সেই লোকটিকে নিয়ে হাজির করলে আমার কাছে। কেন জানিনে সে নিজেই রাজী হোলোনা টাকা দিতে, আমিও বাঁচলুম। সন্তোষ প্রায়ই আসতো, বাগানে ঘাসের উপর বসে আমরা দুজনে জল্পনা কল্পনা করতুম। আমি গান গাই, বাড়ীতে অভিনয় হোলে সেই অভিনয়ের আসরে যাই, এইটে সন্তোষ আদবেই পছন্দ করতো না। মনে আছে তখন 'নটীর পূজা' অভিনয় হচ্ছে আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীর প্রাঙ্গনে। সেই দিনই বিকেলে সন্তোষ এসে হাজির। বল্লুম তাকে, আজ আমাকে ছুটি দিতে হবে। আজ বাড়ীতে 'নটীর পূজা' অভিনয়। সে ক্ষুব্ধ হোলো, আমাকে ভৎসনা করে বল্‌লে—একি বিপ্লবীর উপযুক্ত কাজ। অভিনয় দেখবে, গান শুনবে, এ সবের সময় কি

আজ? বললুম, এসথেটিক দুর্বলতার আরকে ভিজে মন যখন নরম স্যাত্‌স্যাতে হোয়ে গিয়েছিলো তখন আমি নিজেই এসব বর্জন করেছি নিজের মনকে ঋজু, দৃঢ়, বীর্যবান করবার জন্যে। আজ আমার এই বর্জনের প্রয়োজন নেই। আজ গান, কবিতা, অভিনয়, কোনো কিছুর সাধ্য নেই আমাকে বিপ্লবের পথ থেকে সরায়। বরঞ্চ যখনি গান শুনি, অভিনয় দেখি, কবিতা পড়ি তখনই মনের মধ্যে বিদ্রোহ ফণা তুলে গর্জায়, সংকল্প প্রবল হোয়ে ওঠে যে কবে সকলের জন্যে এই আনন্দ পরিবেশন করা সম্ভব হোয়ে উঠবে! তখন এই সমাজ-ব্যবস্থাকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবার জন্যে মনের আকাশে বিদ্রোহের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়। সন্তোষ স্বীকার করলো না আমার যুক্তি, আরো কঠিন বাক্যবাণ ছুঁড়তে লাগলো আমাকে আঘাত করবার জন্যে। টেরারিষ্ট ঐতিহ্যে মনের টুঁটি চেপে সমস্ত রস চুঁইয়ে দিয়ে তাকে কঙ্কাল করবার জোর নির্দেশ ছিলো। বিপ্লবের শিখায় মনকে জ্বালিয়ে নেবার আগে এই শুকতা-সাধনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যখন মালা বদল হোয়ে গেলো সেই শিখার সঙ্গে তখন শুকতার উপর ঝোঁক এই দুর্বলতাকে চিরন্তন বলে মেনে নেওয়ার সামিল। আমি এই দুর্বলতাকে অপরাজেয় বলে মান্‌তে আদবেই রাজী ছিলুম না। সন্তোষ আমাকে প্রীতির চোখে দেখ্‌তো, তা'ছাড়া আমার চেহারায় ও হাবভাবে তখন বোধহয় রসের দুর্বলতার ছাপ কিছু কিছু ছিলো যা' দেখে সে শঙ্কিত হোয়ে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করতো। আমার মন কিন্তু তখন নিঃসংশয় ভাবে গ্রহণ করেছে বিপ্লবকে। গান, কবিতা, কোনো কিছুকে ভয় করবার কোনো কারণ ছিলোনা তার। আমি তখন ইয়োরোপে যখন হিজ্‌লী বন্দী নিবাসে মরলো সন্তোষ ঘাতকদের গুলিতে।

'নটীর পূজা' অভিনয়ের কথা বলছিলুম। সে যে কি অপূর্ব অভিনয় তা' যে না দেখেছে তা'কে বোঝানো শক্ত। ডাকঘর অভিনয়ের পরে এমন অভিনয় আর হয় নি। মালতী সেজেছিলো রাণী, গৌরী সেজেছিলো শ্রীমতী আর বৌদ্ধ ভিক্ষু সেজেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন অভিনয় করেছিলো মালতী, তেমনি অভিনয় করেছিলো গৌরী। যখন আমাদের ফটকের মধ্যে দিয়ে প্রভু বুদ্ধের জয়স্তুতি করতে করতে রবীন্দ্রনাথ প্রাঙ্গনে এসে ঢুকলেন আর সেখান থেকে ষ্টেজে উঠে গেলেন তখন প্রবল ভাবের জোয়ারে আমার সমস্ত শরীর থর্‌থর্ কোরে কাঁপতে লাগলো। গৌরী তাঁর পায়ের কাছে প্রণতা, তিনি আশীর্বাদ করছেন বৌদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ কোরে। সে ছবি আমি ভুলতে পারবোনা এ

জীবনে। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় আমার এই শেষবারের মতো দেখা। তা'র অল্পদিন পরে আমি ইয়োরোপে চলে যাই।

দলের কাজ এগোচ্ছিলো নেহাৎ মন্দাক্রান্তা ছন্দে। প্রবল বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার উজান ঠেলে আমাদের এগোতে হচ্ছিলো। তা'র উপরে অর্থাভাবের মহামারী লেগেই ছিলো। যে সামান্য টাকা সংগ্রহ কোরেছিলুম 'বসন্ত উৎসব' ও 'ঋতু চক্র' করে, সে টাকায় কতো দিনই বা চলে? জেল থেকে বের হোয়ে আসবার পর নলিনী আর মুজফ্‌ফর দুজনেরই শরীর ভালো ছিলোনা। তাদের চিকিৎসাও হচ্ছিলোনা উচিতমত। খাবার যা জুটছিলো তা' খেয়ে সুস্থ লোকেও সুস্থ থাকতে পারেনা। কি কষ্টই যে করেছে মুজফ্‌ফর আর এরা তা বলে শেষ করা যায় না। অনেকদিন হোলো মুজফ্‌ফর আর আমি সরে গেছি পরস্পরের থেকে। তা'র চলার ছন্দের সঙ্গে আমার চলার ছন্দের আদবেই মিল নাই। রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সে আর আমি পরস্পর-বিরোধী শক্তি। আমি ষ্টালিনবাদ ও ষ্টালিনবাদীদের ঘোর শত্রু। ষ্টালিনবাদকে আমি হিটলার ও নাৎসীবাদের চেয়ে কম হিংস্র বলে মনে করিনা। আর মুজফ্‌ফর এই ষ্টালিন ও ষ্টালিনবাদেরই উপাসক। তবুও পঁচিশ বৎসর আগের সেই দিনগুলোকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর সেই কারণেই আমাদের দুজনের মধ্যে সে দিন যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিলো তা'র শিকড় মনের মাটি থেকে একেবারে উপ্‌ড়ে ফেলে দেওয়াও সম্ভব নয়। মুজফ্‌ফর হয়তো পেরেছে; আমি পারি নি।

শ্রমিক-কৃষক দলের দ্বিতীয় কনফারেন্স করবার আয়োজন হোতে লাগলো। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ হলে আমাদের কন্‌ফারেন্স হয়। আমি ছিলুম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সেই কন্‌ফারেন্স দলের নিয়মাবলীর কিছু অদলবদল করা হোলো আর আমি নির্বাচিত হলুম দলের জেনারেল সেক্রেটারী। কন্‌ফারেন্সের শেষ দিনের অধিবেশনের শকলৎওয়ালা এসে বক্তৃতা দিলেন। কনফারেন্সের দু' দিন আগে অধিবেশনে শকলৎওয়ালা কলকাতায় এসে পৌঁছন। আমাদের কাছে খবর পৌঁচেছিলো তাঁর কলকাতায় আসবার। মুজফ্‌ফর আর আমি ঠিক করলুম যে আমরা দুজনে রামরাজতলায় গিয়ে শকলৎওয়ালার সঙ্গে দেখা করবো। সেখান থেকে হাওড়ায় আসতে যে সময়টুকু লাগবে তার মধ্যে আমাদের বক্তব্য তাঁকে জানিয়ে দেবো আর আমাদের কন্‌ফারেন্সে আসবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করবো এই ছিলো আমাদের বাসনা। রামরাজতলায় গিয়ে বম্বে

মেলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিনলুম আমরা থার্ড ক্লাসের টিকিট। তার উর্দ্ধে ওঠবার মতো টাকার মই ছিলোনা আমাদের। ট্রেণ এলো, সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় শকলৎওয়ালা ছিলেন। আমরা দুটিতে উঠলুম তাঁর কামরায়, সুরু করলুম কথাবার্তা। ট্রেণ ছেড়ে দিতে না দিতে উঠ্‌লো এসে টিকিট চেকার। দু'টি থার্ড ক্লাস টিকিট বের করে দিলুম আমরা, কতো দণ্ড হোলো মনে নেই। তবে সে যাই দণ্ড হোক না কেন সে দণ্ড চুকবার মতো সামান্য পয়সাও আমাদের পকেটে ছিলো না। আমি আর মুজফ্‌ফর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি দেখে শকলৎওয়ালা আমাদের অবস্থা বুঝলেন। পকেট থেকে একটি নোট বের করে চেকারের হাতে দিয়ে বল্লেন—আমি এদের ডেকেছিলুম। লজ্জায় আমার দম বন্ধ হোয়ে যাওয়ার সামিল, কোথায় শকলৎওয়ালাকে অভ্যর্থনা করতে এলুম, আর শেষে কিনা তাঁরই পকেট ছিন্ন করলুম আমরা দুজনে! আমরা যে কি নিঃস্ব ছিলুম তা' এর থেকেই বোঝা যাবে। ট্রেণ এসে হাওড়ায় থামলো। বিপিন পাল মহাশয় এগিয়ে এসে শকলৎওয়ালাকে অভিনন্দন জানালেন। বড়বাজারের পুরুষোত্তম রায় একদল মজুর নিয়ে হাজির ছিলো প্ল্যাটফর্মে। আমাদের সহকর্মীরা হাজির ছিলো লাল নিশান নিয়ে। শকলৎওয়ালা লাল নিশানটি টেনে নিয়ে গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে নিশান দোলাতে লাগলেন। কি ভিড় তখন কলকাতার পার্কে পার্কে, টাউন হলে শকলৎওয়ালার বক্তৃতা শোনবার জন্যে। কি অসাধারণ ছিলো তাঁর বক্তৃতার ক্ষমতা! ছোট্ট মানুষটি, হাসি-মাখা মুখ, দরদ-ভরা চোখদুটি। কিন্তু যখন বল্‌তে সুরু করতেন তখন মনে হোতো যেন আগুনের ঝরণা ঝরে পড়ছে। সেদিন রাত্তিরে আমাদের কন্‌ফারেন্সে তিনি প্রায় ঘণ্টা খানেক বক্তৃতা দিলেন। ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে ঝড় তুলে দিয়ে চলে গেলেন শকলৎওয়ালা। তাঁর আগে গান্ধীবাদকে এরকম খোলাখুলি আক্রমণ কেউ করেনি আমাদের দেশে। ১৯২৭ সালে শকলৎওয়ালার সঙ্গে আমার আবার দেখা হোলো মস্কোতে। নভেম্বর বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে তিনি এসেছিলেন। তার পরে বার্লিনে তার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হোয়েছে। তখন থেকে আমাদের চিঠিপত্র বিনিময় সুরু হয়, দেশে ফিরে আসবার পরেও তাঁর কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি পেতুম। তাঁর মৃত্যুতে আমি একজন বন্ধু হারালুম, আর কমিউনিষ্ট আন্দোলন হারালো একজন একনিষ্ঠ কর্মী।

টেরারিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগ থাকে মুজফ্‌ফর এটা পছন্দ করতোনা। তা'র ভয় ছিলো যে আমি হয়তো এই নিষ্ফল রোম্যান্টিসিজমে গা ভাসিয়ে দেবো কমিউনিজমের পথ থেকে সরে গিয়ে। এ ভয়ের কোনই হেতু ছিলোনা। টেরারিষ্ট দলের কর্মীদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, সততা, সাহস ও দেশের প্রতি ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। আমার শ্রদ্ধা ছিলো মানুষগুলির উপর, বিশ্বাস কিন্তু কখনো ছিলোনা তাদের ব্যক্তিমূলক ত্রাসবাদের পন্থার উপর। গান্ধীবাদ থেকে আজি সোজাসুজি কমিউনিষ্ট মতবাদে পৌঁছই। গণ-আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেই আমার রাজনৈতিক চেতনার জন্মলাভ ও বিকাশ। সে চেতনা ব্যক্তিমূলক ত্রাসবাদের সংকীর্ণতার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করেনি। গণ-শক্তির বিরাট বিস্তৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার পর টেরারিজমের অতি সংকীর্ণ পরিধির মোহে ধরা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো। টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে আমার যোগাযোগের দু'টি কারণ ছিলো। রাজনৈতিক ব্যবসাদার এরা কখনো নয়। এদের যদি টেনে নিতে পারা যায় আমাদের শ্রমিক-কৃষকদলে, এরা যদি আমাদের মতবাদ গ্রহণ করে তা' হোলে আমাদের দল শক্তিশালী হোয়ে উঠ্‌বে এই ছিলো আমার বিশ্বাস। টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে কিছু লোককে টেনেও নিতে পেরেছিলুম আমাদের দলে। তা'র বিপদ যে ছিলোনা তা' নয়। টেরারিষ্ট দলগুলির সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্টতা পুলিশের মনে আমাদের দল সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাতে পারে এই আশঙ্কাও যথেষ্ট ছিলো, হলোও তাই। জোড়াসাঁকোর গলির মোড়ে আর আমাদের অফিসের নীচে গোয়েন্দা বিভাগের চরেরা ভন্‌ভনাতে লাগলো সকাল সন্ধ্যে। আমার সম্বন্ধে পুলিসের সন্দেহ ক্রমশঃই ঘন হোয়ে উঠ্‌লো। প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের বাড়ীর কোনো যোগাযোগ ছিলোনা। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংরেজ শাসকদের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন বটে তবুও তাঁদের চরিত্রে আর একটা দিক ছিলো যার জন্যে তাঁরা সুধীসমাজে সম্মান পেয়েছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংগীত বিষয়ে তাদের অনুশীলন ছিলো গভীর, অনুরাগও ছিলো। বঙ্গ-সাহিত্যের বহু দুস্থ সাধকদের তাঁরা সাহায্য করেছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন শুধু ইংরেজ শাসকদের উপর সীমাহীন ভক্তি আর তাঁবেদার-সুলভ আনুগত্য, আর কিছু নয়। আমরা কখনো প্রদ্যোতকুমারের ওখানে যেতুম না,

তিনিও আসতেন না। এই ধরণের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আমাদের পরিবারের স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিলো। গভর্মেণ্ট হাউসে আসাযাওয়ায় আর রাজকর্মচারীদের খাতির করার কাজেই প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের দিন কাটতো। পুলিশ কমিশনর টেগার্ট ছিলো প্রদ্যোতকুমারের দোস্তদের অন্যতম। বাগানবাড়ীর প্রমোদ-উৎসবে টেগার্ট কখনো বাদ পড়তো না। আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে টেগার্ট প্রদ্যোতকুমারকে বলে, আর সে যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবে তা'ও জানায়। আমার জ্যাঠামহাশয় গগনেন্দ্রনাথকে সব কথা জানিয়ে দেন প্রদ্যোৎকুমার। আমি তখন কুমিল্লায়, কুমিল্লা থেকে ফিরে এসে দেখি বাড়ীর শান্ত আবহাওয়ার সরোবরে কে যেন পাথরের টুক্‌রো ফেলেছে, চঞ্চল হোয়ে উঠেছে আবহাওয়ায়। আমার পিতা আমাকে ডেকে সব কথা বল্লেন। বুঝলুম ব্রিটিশ সিংহী তা'র ল্যাজের ঝাপ্‌টায় আমাকে লোহার গারদের পেছনে পাঠাবার মতলব করেছে। দলের অফিসে এসে মুজফ্‌ফর আর নলিনীকে ব্যাপারটা সব জানিয়ে দিলুম। দু'টি পথ খোলা ছিলো তখন, গরাদের পেছনে চলে যাওয়ার সরু সড়ক আর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সুদূর ও অজানা রাস্তা। স্থির করলুম যে দেশ ছেড়ে ইয়োরোপে যাবার জন্যে চেষ্টা করে দেখা যাক। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তখন আমাদের কোনো যোগ ছিলোনা বল্লেই চলে। মাঝে মাঝে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি আগুণের ফুল্‌কির মতো উড়ে এসে পড়তো আমাদের হাতে আর কচিৎ কখনো নানা আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে খবর এসে পৌঁছতো ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির থেকে। শুধু অনুরাগের মালমশলা দিয়ে বিপ্লবপন্থী দল তৈরী করা যায় না, তা'র গঠনে অনেক রকমের উপাদান লাগে। সে সব তখন আদবেই ছিলোনা আমাদের। যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে সেই সব উপাদান সংগ্রহ কোরে আনতে পারি, নিজেকে তৈরী করতে পারি ভারতবর্ষের বিপ্লবের কাজের জন্যে তা' হোলো অনেক এগিয়ে যাবে আমাদের কাজ, এই ছিলো আমার ধারণা। মুজফ্‌ফর ও নলিনী আমার মতে সায় দিলো। শুধু শুধু জেলে আটক থেকে কি হবে? যদি রাশিয়ায় চলে যাওয়ার কোনো পথ খোলা থাকে তো তা'র চেয়ে ভালো আর কিছু হোতে পারেনা। এই হোলো আমাদের তিনজনের সিদ্ধান্ত। বাড়ী এসে পিতাকে বল্লুম যে আমি যদি ইয়োরোপ চলে যাই তা হোলে কেমন হয়? ইয়োরোপে যাওয়ার পেছনে যে কি উদ্দেশ্য গোপন রয়েছে তা' অবিশ্যি তাঁকে জানালুম না। তিনি তখুনি সায় দিলেন। বোধ হয় আশ্বস্ত হোলেন ভেবে

যে জেলের হাত থেকে আমি বেঁচে গেলুম, হয় তো এও ভাবলেন যে ইয়োরোপে গেলে আমার মনের ধারা অন্য পথ দিয়ে বয়ে যেতেও পারে। আমার চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হবে জেনেও তিনি শুধু আমাকে জেল থেকে বাঁচাবার জন্যে সম্মতি দিলেন। লেগে গেলুম আমি যাবার জন্যে তোড়জোড় করবার কাজে। আমার মতো লোকের পক্ষে পাসপোর্ট পাওয়া দুরূহ ছিলো। আজও যেমন সেদিনও তেমন পাসপোর্ট নির্ভর করতো পুলিশের রিপোর্টের উপর। পুলিশ কমিশনার আর গোয়েন্দা বিভাগ দেশ শাসন করতো, ইংরেজ গভর্ণর উঠ্‌তো বস্‌তো এদেরই ইঙ্গিতে। পুলিশ কমিশনর টেগার্ট ছিলো বাঙলা গভর্মেণ্টের কায়েদে আজম। পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত পেশ করবার কয়েকদিন পরেই তলব এলো লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারসেতে হাজির হোতে পাসপোর্টের জন্যে। পাসপোর্ট পেয়ে গেলুম, বুঝলুম আমাকে জেলে না পুরে দেশ থেকে সরিয়ে দিতে চায় টেগার্ট। পরে বোধ হয় তা'র আপশোষের অন্ত ছিলোনা, কোন ভুলে সে পাসপোর্ট দিলো আমাকে! ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস, সব আয়োজন সারা কোরে আমি তৈরী। জাহাজ ধরবার জন্যে আমাকে কলম্বো যেতে হবে। কাপড়ের টুক্‌রোর উপর দলের হুকুমনামা তৈরী হোলো। দল যে আমাকে মস্কো পাঠাচ্ছে তা'র প্রতিনিধি স্বরূপ, সেটা লেখা ছিলো সেই কাপড়ের টুক্‌রোতে। সেই টুক্‌রোটি টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে সেলাই কোরে নিলুম। মুজফ্‌ফর, নলিনী আর আমি, আমাদের ত্রয়ীর বৈঠক বস্‌তো প্রায় রোজই। আমার সহকর্মীরা আমার চেয়ে কম উত্তেজিত ছিলোনা আমার যাওয়া সম্বন্ধে। দিন ঘনিয়ে এলো, জাপানী জাহাজে যাবো ঠিক করেছিলুম। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট ছিলো আমার। একটি পরিচিত যুবক ইয়োরোপে যাবার জন্যে খুব উদ্‌গ্রীব ছিলো, কিন্তু কিছুতেই বাড়ীর অমত কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছিলোনা। আমার সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট বদলে ছুটো থার্ড ক্লাস টিকিট কিনে তাকেও সঙ্গে নিলুম। যাবার দিন যতো ঘনিয়ে আস্‌তে লাগলো ততো বাড়তে লাগলো অস্থিরতা আমার মনের মধ্যে। যে বিরাট অজানা সমুদ্রে আমি ঝাঁপাতে চলেছিলুম তার ঢেউকে আমার কোনো ভয় ছিলোনা। অজানা কখনো আমাকে ভয় দেখাতে পারেনি। আমি বুঝতে পারছিলুম যে এবার আমার চরম ছাড়াছাড়ি হবে অতীতের সঙ্গে। সেই অতীতের উপর যেখানে ছুরি পড়বে সেটা বিঁধ্‌বে গিয়ে আমার পিতার বুকে। আমার চলে

যাওয়া তাঁর পক্ষে হবে মৃত্যুদণ্ড। তবু উপায় ছিলো না। আগে প্রতিদিন বিকেল বেলা তিনি বেড়াতে বের হোতেন। বাড়ী ফিরতেন রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ। কিছুকাল থেকে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছিলো, বাড়ী থেকে খুব কদাচিৎ বের হোতেন। ক্রমশ যেন সব কিছু ছেড়ে নিজেকে একলা কোরে নিচ্ছিলেন। আমার ইয়োরোপ যাবার আগে তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে নিতেন তাঁর ঘরে। চুপটি কোরে শুয়ে থাক্‌তেন কৌচে, আমি বসে থাকতুম তাঁর মাথার কাছে তক্তপোষে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন ছ'চারটি কথা। বুঝতে পারছিলুম তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছেন। যাবার দিন এলো, বৈশাখের সে এক রৌদ্র দগ্ধ দিন। বিকেলের গাড়ীতে মাদ্রাজ যেতে হবে, সেখান থেকে যেতে হবে কলম্বো জাহাজ ধরতে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলুম। ইয়োরোপ সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লেন। প্রণাম কোরে বিদায় নেবার আগে যে কথাটি বলেছিলেন সেটি আজও মনে আছে—গুরুর পেছনে ছুটিস্ নে। তোর ভিতরে যে গুরু আছেন তাকে জাগ্রত কর্। তখন দেখবি লোক আপনি আসবে তোর কথা শুনতে। পিতা তাঁর ঘরে কৌচে বসেছিলেন, তাঁর কাছে এসে বসলুম। তিনি ছ'তিনবার বললেন—তুমি তো ছ'এক বছরের মধ্যেই ফিরে আস্‌বে, তাই না? আশ্বাস দিলুম তাঁকে, কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি কেন তিনি একথা বারবার আমাকে শুধোলেন। পরে বুঝেছিলুম যে এ পারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হোতে বেশী দেরী নেই এটা তিনি বুঝেছিলেন। তাই বোধ হয় তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিলো যে আমার সঙ্গে তাঁর যেন দেখা হয় শেষ খেয়ার আগে। প্রণাম করলুম, কিছু বল্‌লেন না। শুধু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এলেন দেউড়ী পর্য্যন্ত। গাড়ীতে উঠলুম, ফিরে দেখলুম তখনো তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—শীর্ণ মুখ, চোখ ছুটি শান্ত, বেদনায় ভরা। সব কিছুর মধ্যে থেকেও মানুষ যে কেমন করে একলা হোয়ে যায় তা' তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝলুম। একলার এমন অসহ্য ও নিবিড় রূপ আমি আর কখনো দেখিনি। এ জীবনে সেই শেষ বারের মতো তাঁকে দেখলুম। একদিন বিকেলে কলম্বো থেকে জাহাজ ছাড়লো। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখলুম ভারতবর্ষের তীর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো ঢেউয়ের মধ্যে। মনে হোতে লাগলো সারা দুনিয়ায় কেউ যেন নেই, শুধু আমি আর এই পাগল নীল ঢেউগুলো। একটা অসহায় নিঃসঙ্গতা আচ্ছন্ন করলো আমাকে! শুধু মনের

চোখে ভাসতে লাগলো বৈশাখের সেই বিকেল বেলাটি। দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো মানুষটি, চারিদিকে চলাচল, শুধু একা তিনি যেন পাথর হোয়ে গেছেন। এ পৃথিবীর হোয়েও তিনি যেন এ পৃথিবীর সঙ্গে সব দেনাপাওনার সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছেন। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছি রেলিং ধরে। সমুদ্রের নোনা হাওয়া ঝাপ্‌টা মারছে চোখে মুখে, বিদ্রূপের হাসির মতো আঘাত করছে আমাকে এসে। আমিও যেন পাথর হোয়ে গেছি। নীল সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজ এগিয়ে চল্‌লো অন্ধকারের দিকে।

ক্রমশঃ

চার ইয়ার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বলতে কি, মলয় না থাকলে আমাদের এ গল্প জমত না, বোধ করি অসম্পূর্ণ থাকত কাহিনী।

সকলের শেষে ভগবান ওকে পাইয়ে দিলেন।

বিশ বছর পর আবার একজায়গায় সব জড় হলাম। কোথায়?

তার আগে শুনুন আমরা কে।

চারজন।

সিগারেটের টিন ও তাসের প্যাকেট নিয়ে কলেজের কমনরুম সরগরম ক'রে রাখা বিখ্যাত সেই চার বন্ধু। হাবুল হালদার, মলয় নাগ, জোনাকি সেন ও আমি।

আ, একসঙ্গে ব'সে চারজন অনেক সিগারেট ফুঁকেছি তাস পিটেছি পার্কের নিরালা কোণে ঘাসের বিছানায় শুয়ে প্রেমের গল্প করেছি। ছুটির দুপুর কেটেছে সস্তা ভদ্র কোনো রেষ্টুরেণ্টে আড্ডা মেরে।

আশ্চর্য, ছুটির দিনেও শহর ছেড়ে কেউ কোথাও তখন পা বাড়াইনি সুখের আড্ডাটি ভেঙ্গে যাবে ভয়ে।

আজ, মস্তবড় ছুটির দিনে, সময়টিও ঠিক যখন দুপুর, আগষ্টের গনগনে রোদে রাস্তার অ্যাশ্‌ফেল্ট তেতে পাগলা কুকুরের মত খেপে গেছে, কামড়ে ধরছে লোকের জুতো, মোটরগাড়ির টায়ার, রিক্সার ঠ্যাং চার ইয়ারের তখন পুনর্মিলন হ'ল। হ্যাঁ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের দরজায়। কী জায়গা একবার চিন্তা ক'রে দেখুন।

সবচেয়ে কষ্ট হ'ল মলয়কে দেখে।

ঘামছিল ও। পকেট থেকে টুক্‌টুকে নীল রুমাল বার ক'রে ঘাড় মুছছিল। কপাল!

অবশ্য এক আড্ডার ইয়ার হলেও মলয় ছিল বয়সে আমাদের সকলের ছোট।

তাই, তখন থেকেই ওকে আমরা আদর দিতাম বেশি, স্নেহ করতাম,

রাস্তায় বেরোলে তিনজনের মাঝখানে রেখে সর্বদা পথ চলেছি। ফুটবল খেলার মাঠে মলয়ের গায়ে ভিড়ের চাপ লাগবে ভয়ে তিনজন হাতের বেড়ি আলগা করিনি। আর, দেখতে ও চিরদিনই সুন্দর কিনা। কালো কোঁকড়া চুল, ফর্শা রং, মেয়েদের মতন লম্বা টাইপের মুখ।

রুমালে মুখ মোছা শেষ ক'রে, দেখি, পকেট থেকে ও চীনাবাদাম তুলছে। দামী সুট্ পরনে, জুতোর চাকচিক্য অম্লান আছে, সুন্দর ফিরোজা রঙের নেক্‌টাই। এবং এত বয়সেও, লক্ষ্য করলাম মুখকান্তি বিমলিন হয়নি।

অর্থাৎ সবই আছে, সবই ছিল, নেই, শুধু ছিল না—

বুঝতে বাকি রইল না। আমাদের অবস্থা।

ভালো কথা, আগে আমাদের তিনজনের সাক্ষাতের বিবরণটা সেরে নিই।

প্রথমে হাবুলের সঙ্গে আমার দেখা স্ট্র্যাণ্ড রোডে। হাওড়া থেকে পায়দল করছিলাম। ড্যালাহৌসী গন্তব্য। উত্তরপাড়ার বাসিন্দা আমি। বহুকালের ডেলীপ্যাসেঞ্জার। আজও আছি। অবশ্য এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। বেলা ৯ টায় না এসে সাড়ে-বারোটায় মহানগরীর জঠরে ঢুকি। রুদ্ধশ্বাসে ট্রামবাস চাপবার আজ আর দরকার নেই। রোদ-পোড়া, চওড়া ফাঁকা সড়ক ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে সুরু করি। এক সময় গিয়ে অফিস-পাড়ায় পৌঁছলেই হ'ল। হাতে এখন অঢেল সময়।

বস্তুত রাস্তাটা বেশি ফাঁকা ছিল বলেই চোখে পড়ল হাবুলকে। একটা লাইটপোস্টের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হা ক'রে ও গঙ্গার ওপরের আকাশে দেখছিল চিল। বুঝলাম ওরও হয়ে গেছে। বেলা যখন আড়াই প্রহর, অফিস আদালত গম্‌গম্ করছে, তখন, এক মাথা চুল ও এক গাল দাড়ি নিয়ে কেউ রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকলে কি বোঝা যায়? ময়লা, অর্ধছিন্ন বেশবাস বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য আমার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট হ'ল দেখে—হোক্ তালিমারা সহস্র পটি লাগানো, আমার পায়ে তবু এক জোড়া ডার্বি ছিল—হাবুলের পদযুগল নির্মমভাবে শূন্য। ছেঁড়া স্যাণ্ডেলটিও না।

'কামাখ্যা! মাইরি একযুগ পরে দেখা।' হাবুল আমায় দেখেই চিনল। এক গাল গোঁফ দাড়ি সমেত হাসল। 'তারপর?'

'খবর কি?' আমিও হেসে প্রশ্ন করলাম। 'কোন্ দিকে চললে?'

'এখন আর দিক্ ফিক্ নেই। যেদিক খুশি হাঁটলেই হ'ল।' হাবুল শব্দ ক'রে হেসে ওঠল। সংসারাভিজ্ঞ লোক। আমায় এক নজর দেখেই

সে ধরে ফেলল। তেমনি হেসে বলল, 'কবে গেছে তোর, কদিন এই হাল?'

'জুনে গেছে।' বললাম। 'আজ তিন মাস স্রেফ বস্যা।'

'আমার গেছে মার্চে। দে, বিড়ি ফিরি থাকে তো দে।' হাবুল আমার হাত ধরল। 'সঙ্গী পেয়েছি এখন আর হাঁটতে কষ্ট নেই।' অর্থাৎ পুরোনো বন্ধু পেয়ে ও মহাখুশি। নিজেদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করতে করতে দু'জন অগ্রসর হচ্ছিলাম, কয়লাঘাটা স্ট্রীটের মুখে হঠাৎ জোনাকির সঙ্গে দেখা। হ্যাঁ, সেই জোনাকি। দেখেই ও আমাদের চিনল আমরাও চিনলাম। অপ্রত্যাশিত এই মিলন তিনজনের রাস্তার ওপর, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হৈ হৈ ক'রে ওঠলাম।

আমাদের চেয়ে জোনাকি মাথায় যেমন লম্বা বেশি তেমনি চালাকও বেশি। আমরা 'ছাঁটাই' কথাটা প্রয়োগ করলাম, হাবুল ও আমি। জোনাকি তার অবস্থার কথা ঘুরিয়ে অন্যভাবে ব্যক্ত করল। এবার ও ঠিক এক্‌জিকিউটিভ হয়ে যেতো, তা ফার্ম যদি কুপোকাত হয় তো সে করবে কি, কার দোষ।

'কালের দোষ।' হাবুল হি হি ক'রে হাসল। জোনাকরি গায়ের আদ্দীর পাঞ্জাবি ময়লা হয়ে গেছে মাথার টেরি গেছে ভেঙ্গে। 'আবার বাগাব, জবরদস্তরকমের একটা বাগিয়ে নেব, দেখিস।' বলল ও দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি ও হাবুল দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মনে মনে বললাম, 'সেই বাগানো যত শীগ্‌গীর সম্ভব হয়, বন্ধু, তত মঙ্গল। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পায়ের তলা ক্ষয়ে গেছে, ছাখো।'

আশা ছিল, বরাবর আমরা ধারণা ক'রে রেখেছিলাম, চতুর ও তার্কিক জোনাকি ব্যারিস্টার হবে, এটর্ণি হবে, উকিলও হ'তে পারে, কিন্তু ও যে শেষ পর্যন্ত চাক্‌রিতে ঢুকেছিল এই প্রথম শুনলাম। যাক্‌গে পুরোনো বন্ধুদের পেয়ে জোনাকিও ভারি খুশি, লক্ষ্য করলাম। আমাদের মুখ শুকনো ছিল। গাল ভরা পান ছিল ওর মুখে। মোড়ের পানের দোকান থেকে তৎক্ষণাৎ সুরভি জর্দা সমেত পান খাইয়ে দিলে ও আমাদের এবং দু'জনের হাতে গুঁজে দিলে দুটো গোল্ডফ্লেক। অর্থাৎ হাবেভাবে এটুকু সে জানিয়ে দিলে দিন অচল হলেও পান সিগারেট তার চালু আছে এবং যদিও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আফিসে নাম লেখাতে এসেছে পকেটে খুচরো খরচের আট দশ আনা এখনো নড়াচড়া করছে। আমারও সামান্য দু'চার আনা যদি বা সম্বল ছিল, হাবুলের

একেবারে কিছুই নেই অনেকক্ষণ টের পেয়েছিলাম, ফতুর ফকির সেজে বসে আছে বেচারা।

কিন্তু তাতে কি।

বন্ধু বন্ধু।

দেখলাম জোনাকি হাবুলের হাত ধ'রে হাঁটতে লাগল। আশ্বস্ত হলাম। ভাল লাগল এই জন্যে যে সুদিনে কার অবস্থা ভাল কার মন্দ ভেবে আমরা যেমন পরস্পর হাত মেলাতে ইতস্তত করিনি তেমনি আজ দুর্দিনে দেখা হতে না হতে একজন আর এক জনের হাত ধরলাম। জোনাকি ধরেছিল হাবুলের ডান হাত আমি বাঁ। আলু পটল কণ্ট্রোল কাঁকড় প্লেগ পারমিটের আলোচনা ঢের হয়েছে, বরং সেগুলো বর্জন ক'রে পুরোনো দিনের সুখের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তিন বন্ধু অগ্রসর হচ্ছিলাম। বলব কি মনে হচ্ছিল পুরোনো আমলের সেই চায়ের দোকানের আড্ডাটি নেমে এসেছে রৌদ্রদগ্ধ কাউন্সীল হাউস স্ট্রীটে। তবে হ্যাঁ, তিন পায়া হয়ে চলছিল আড্ডা, চতুর্থ পায়া পূর্ণ হ'ল রিজিওন্যাল এমপ্লয়মেন্ট এক্স্‌চেঞ্জ আফিসের লম্বা ঘিঞ্জি করিডোরে এসে। মলয়! আমাদের মলয়।

তিনজন চমকে ওঠলাম।

বুকের মধ্যে হু হু ক'রে উঠল।

অবশ্য আনন্দও যে না হ'ল মলয়কে পেয়ে তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হ'ল দুঃখ।

শেষটায় মলয়ও দলে এল।

আ, কী পরিষ্কার মাথা ছিল ওর অঙ্কে। এক সঙ্গে দিনরাত তাস্ খেলে সিগারেট ফুঁকেও এত ভাল পাশ ক'রেছিল ও এক একটা পরীক্ষায়, —না, আমরা হিংসা করিনি, বরং গর্ব ছিল মনে এই ভেবে যে, মলয়ের হ'লেই আমাদের হ'ল, ও যে আমাদেরই একজন। শুনেছিলাম কোথায় যেন ও খুব ভাল চাকরি করত। কতকাল দেখা নেই। শেষটায় সেই সোনার ছেলেও· ···

'কি ব্যাপার!' তিনজন ঘিরে দাঁড়ালুম মলয়কে। 'খবর কি?'

'ছবুলা ব্রাদার্সে ছিলুম, ব্রাদার।' প্রথমে আমার, তারপর জোনাকির চোখে চোখে চেয়ে মলয় মলিন হাসল। ওই শালা এক মাদ্রাজী এসে ওপর-নীচ সব কচু-কাটা ক'রে দিলে।'

'মন্দার বাজার ঘোরতর দুর্দিন।' হাবুল হাউ হাউ ক'রে ওঠল।

'ভাল মন্দ কেজো অকেজো কিছুই দেখলে না ব্যাটা', মলয় বলছিল, 'তা ছাড়া কতদিন তো হ'য়েছিল সার্ভিস আমার—'

'সে সব কি আর দেখে ওরা।' জোনাকি বলছিল, 'না তুই দেখবি তোর বাড়ীর মেহেদীর বেড়া ছাঁটতে গিয়ে কোন ডাল নতুন কোনটা পুরোনো?'

বোকার মত তাকিয়ে মলয় জোনাকির কথা শুনল।

কষ্ট হচ্ছিল আমাদের আরো বেশি এই জন্য যে, অমন সুন্দর চেহারা দামী স্যুট্ ও মূল্যবান মগজ নিয়েও মলয় বাতিল হয়ে গেছে, খড়-কুটোর মত ভেসে এল এখানে। এখন বেলা একটা। কোথায় ছবুলা ব্রাদার্সের এয়ার-কণ্ডিশন্ড ঘরে ব'সে ও আইসক্রীম, পাকা পেঁপে, দ্বারিকের দু'টো ভাল সন্দেশ দিয়ে লাঞ্চ্ খেতো, তা না, এখানে দাঁড়িয়ে খুটে খুটে শুক্‌নো চীনাবাদাম চিবোচ্ছে। মনে মনে বল্‌লাম, বরাত। সব থেকেও অসহায়, কেন না—

'মামাশ্বশুর বড়লোক, কোলকাতার বিখ্যাত হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট, তাঁর জোরেই ওই সোনার চাকরি। চাকরি হারিয়ে আমি বোকা হয়ে গেছি।' মলয় হতাশ চোখে আমাদের তিন জনের মুখের দিকে তাকালো।

'মামাশ্বশুরকে ধ'রে আর একটা বাগিয়ে নে।' জোনাকি বলল, মলয় অল্প হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'শ্বশুর কি আর আছে। শ্বশুরের হ'য়ে গেছে। কারবার ফেল্ পড়ে তালুকদার মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, জোর জেল্লা কিছুই নেই আজ তাঁর।'

'তবেই বোঝ।' ড্যাবডেবে চোখে হাবুল আমার দিকে তাকাল। 'লোহা লক্কড় গলে ধুয়ে এ বাজারে একাকার, আমরা কোন্ ছার।' আমি ঘাড় নেড়ে হাবুলকে সমর্থন করি।

'সিগারেট খা।'

আদর ক'রে জোনাকি মলয়ের হাতে সিগারেট দিতে গেল, দেখি মলয় ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখছে। মিনিটে মিনিটে চাকুরিপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। ভিড়,—বেশ বড় রকমের ভিড় জমে গেছে আফিসের বারান্দায়। ভিড়ের চাপ ক্রমশ এদিকে সরে আস্‌ছে, আমাদের দিকে। লক্ষ্য করলাম।

মলয় বলল, 'দম বন্ধ হয়ে যাবে,—এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আমি মরে যাব, কামাখ্যাদা।' বন্ধুদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ আমি। তাই আমার দিকেই ও মুখ ঘোরাল।

আরো বেশি কষ্ট লাগল। এবং ও যে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে বেশ বোঝা গেল। বললাম, 'না, এখানে দাঁড়িয়ে কথা কি—চল একটু ওদিকে যাওয়া যাক্।'

মলয় সহ তিনজন ভিড় ছেড়ে ফাঁকার দিকে চল্‌লাম। বিশ বছর আগের কৈশোর-যৌবনের ছবি মনে পড়ল। তখন ছিল খেলার মাঠ। ফুটবল খেলা।

এটি সংসার-সমরাঙ্গন।

আর খেলাও যে-সে নয়, ভাগ্য নিয়ে, মানুষের জীবন।

সেই খেলার দর্শকের ভিড়ের চাপ মলয়ের গায়ে না লাগে, হাতের বেড়ি লাগিয়ে তিনবন্ধু ওকে নিয়ে নতুন ক'রে যেন রাস্তায় নামলাম।

'সত্যি, ব্রাদার তিন দিনে আমি টায়ার্ড হ'য়ে গেছি।' মলয় গরম অ্যাশ্‌ফল্টের ওপর পা রাখতে গিয়ে মুখ বিকৃত করল।

'তিন দিন, কামাখ্যাদা হাঁটছে তিন মাস। আমার বছর ঘুরতে চল্‌ল।' হাবুল হাসছিল। 'তুই, জোনাকি?'

'থাক না ওসব আলোচনা এখন।' একটু ধমকের সুরে জোনাকি বল্‌ল, 'আয় গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নিই, একটু গল্পসল্প করা যাক্।'

'সত্যি তো, কতকাল পর সব একত্র হ'য়েছি।' বললাম আমি।

অর্থাৎ মলয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই সে সব আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখতে চাইলাম আমরা। হাবুল চুপ। রৌদ্রে মলয়ের সুন্দর মুখ এরি মধ্যে আবার টুক্‌টুকে লাল হ'য়ে ওঠেছে লক্ষ্য করলাম।

চারজন উল্টোদিকের পেভমেণ্টে উঠে একটা আতাগাছের ছায়ায় দাঁড়াই। জোনাকি ইতিমধ্যে আর এক প্রস্থ সিগারেট বিলিয়েছে সবাইকে। হাবুল অসমর্থ, জানি। আমি, আমার পুঁজিও সামান্য, তবু তাড়াতাড়ি, হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে, ফেরিওয়ালার কাছ থেকে চার আনার কচি শশা কিনে ফেললাম।

না, বন্ধুর কাছে বন্ধু লজ্জা নেই। যার যেমন সামর্থ, যখন যেমন সম্বল। বন্ধুকে খাইয়ে বন্ধুর কাছ থেকে খেয়ে চিরদিন আমরা তৃপ্তি পেয়েছি, তা যতো সামান্য যতো ক্ষুদ্র খাদ্য হোক্।

বলব কি, কোনো এক গরমের দুপুরে কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে ব'সে 'হ্যাপি-বয়' খাওয়ার মতন এই বয়সে আবার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চারজন নুন মাখানো শশা খেতে লাগলুম।

একবার কল্পনা করুন।

চেহারা ও বেশভূষার বিচারে আমার ও হাবুলের হাতে শালপাতার ঠোঙা তবু যাহোক্ মানিয়ে গেছিল, আদ্দীর পাঞ্জাবি গায়ে লপেটা পায়ে জোনাকির হাতে ঠোঙাটা ঠাট্টার মত ঠেক্‌ছিল। সব চেয়ে বেশি করুণা হচ্ছিল সুশ্রী, সুছাঁদ, টাই-স্যুট্, পরা ঠোঙা হাতে মলয়কে পাশে দেখে।

মনে মনে বললাম, উপায় কি।

'বড্ড helpless হয়ে পড়েছি।' ঠোঙাটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মলয় এক সময় বলল।

বললাম, 'মনে সাহস রাখতে হয়, অত ভেঙ্গে পড়লে চলে।'

'এই তো সবে সুরু।' হাবুল বলল, 'লিলুয়া হাওড়া হেঁটে হেঁটে আমার—'

হাবুল কথা শেষ করার আগে সিগারেটের আল্‌তো ধোঁয়া ছেড়ে দার্শনিকের মত জোনাকি মন্তব্য করল, 'সময়, সময় না হলে কিছুই হবে না ব্রাদার, নইলে আমার মত তুখোর ছেলে আট মাসেও একটা কুটো কামড়ে ধরতে পারছে না, বুঝিস না?'

শুনল মলয়। চুপ থেকে একটা ঢোক গিলল।

বললাম, 'আর খবর কি তোর?

কিন্তু সে কথা মলয়ের কানে গেল না।

'আমি কি জানি না, খুব জানি। আর একটি জোগাড় হ'তে সে অনেক দিন। অনেক রোদে গা পোড়াতে হবে, অনেক ধুলো নাকে নিতে হবে।'

রাস্তার রৌদ্রের দিকে চেয়ে মলয় শিউরে উঠল। 'কিন্তু শোনে কে, কে বোঝায় ওকে। আজই যাও, এক্ষুনি যোগাড় করে আনো।'

'কে, কে এমন অবুঝ?' জোনাকি ভ্রূকুটি করল।

'ব্রাদার, সহস্র হাত জলের নীচে ডুব দিয়ে মুক্তা তোলা সহজ, কিন্তু সহস্র দরজায় ঢুঁ মেরেও তুমি তিন দিনে চাকরি যোগাড় করতে পারছো না।' হাবুল রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

আস্তে মলয়ের একটা হাত ধরে অল্প হেসে বললাম, 'কে, কে বলেছে তোকে আজই যাও, এক্ষুনি চাই? স্ত্রী?' কথা না কয়ে মলয় ঘাড় নাড়ল।

তিনজন চুপ ক'রে রইলাম।

মলয়ের সঙ্গে দেখা হবার একটু আগে এই আলোচনাও হয়েছিল আমাদের।

পরিবার বলতে হাবুলচন্দ্র বিগতদার। তা হলেও গ্যাস্‌ট্রিক আল্‌সারে পঙ্গু বড় ভাই আছেন ওর মাথার ওপর বৃহৎ পরিবার নিয়ে। সেজন্যেই ও নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। আমি, বিগতদার না হলেও, বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিনা অছিলায় দারাকে দিনকতক দূরে ঠেকিয়ে রেখেছি, মানে লামডিংএ ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে কোনো রকমে এসময়টায় নিশ্বাস ফেলছি। জোনাকি অবশ্য চিরকালই চালাক। বিয়ে করেনি ওই বয়সেও। ব্যাঙ্ক, ব্যবসা, স্পেকুলেশন নিয়ে ব্যস্ত। তবে বুড়ো বাপ মা আছেন অপোগণ্ড একটা ভাই আছে। ওদের জন্যে ভাবনা।

তা হলে বেশ বোঝা গেল, মলয়ের মত অবস্থা আমাদের কারোর না।

অর্থাৎ অনবরত কেউ পিছন থেকে তাড়া করছে না ঠেলা মারছে না, আজই চাই এক্ষুনি হোক্। যা নিতান্তই অসম্ভব।

'আর কি বলছে বৌ?'

এক চোখ ছোট করে জোনাকি এক সঙ্গে অনেকগুলো ধুঁয়া ছাড়ল। 'দারুণ ক্রাইসিস। রাতারাতি জব্ পাওয়া মুস্কিল স্রেফ্ বলে দিবি গিন্নীকে।'

'হুঁ, যদি এতকাল সুখ ক'রে থাকেন, দিনকতক এখন দুঃখভোগ করতেই হবে।' হাবুল মলয়কে বোঝাল। 'বৌদিকে বলবি মাছ ডিম কিছুকাল বন্ধ থাকবে। বিউলির ডাল আর ডাঁটা শাক চলুক এখন থেকে দু'বেলা।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'মুখে তো বিশেষ কিছু বলছে না, বলছে ওর ভুরু দু'টো। উঃ আমার চাকরি যাওয়ার দিন থেকে তোমরা কেউ যদি মঞ্জুর চেহারা দেখতে।' মলয় অসহায় চোখে তিন বন্ধুর চোখের দিকে তাকাল।

'দুই ভুরুর মাঝখানটা বুঝি সুয়েজ খাল হয়ে আছে?' জোনাকি মঞ্জুর বিরক্তিব্যঞ্জক মুখটি বর্ণনা করল।

মলয় মাথা নাড়ল।

'বলছে, এখন বাড়ি-ভাড়া বন্ধ হবে, খুকুর দুধ বন্ধ হবে, আমার গয়না বাঁধা পড়বে।' মঞ্জু মুখে কি বলছে মলয় বলল।

'মুস্কিল! এ ব্যাপারে মেয়েদের এমন অস্থির হলে চলে?' আমি মন্তব্য করলাম। 'হৃদয়হীন', হাবুল ফোঁস্ ক'রে উঠল। 'আমার সঙ্গে কথা

বলছে না, কথা বন্ধ করেছে ও যেদিন শুনল আমার চাকরি গেল।' বলতে বলতে মলয় প্রায় কেঁদে ফেলল।

সেই ড্যালহৌসী। বেলা তখন দু'প্রহর। একমাত্র আমরাই বুঝলাম, দেখলাম বাড়ীতে কি অশান্তি যাচ্ছে বন্ধুর। অথচ, ওর জুতোটি এখনও চমৎকার চক্‌চক্ করছে, সুন্দর টাই, পরিচ্ছন্ন শার্ট ও পেন্টুলন। অর্থাৎ আজই, এখনই এমন অভাব আরম্ভ হয়নি নিশ্চয় মলয়ের যে—

'চ—আমরা যাই, আমরা গিয়ে তোর বৌকে বোঝাই।' জোনাকি এক চোখ ছোট ক'রে মলয়ের দিকে তাকাল।

'আমার সঙ্গে মঞ্জু আজ তিন দিন কথা বলছে না, তোমরা আইডিয়া করতে পার জোনাকিদা?' মলয়ের দুই ঠোঁট ভয়ানক কাঁপছিল।

আমি বললাম, 'সুখের সময় মানুষকে বোঝা যায় না। দুঃখের দিনেই হৃদয়ের পরীক্ষা হয়। পেসেন্স্, টলারেশন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর জীবন সুখের হ'তে পারে না। বুঝিয়ে বলবি।'

'বাচ্চা ক'টি?' জোনাকি গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল।

'একটি, একটা বেবী। ওই নিয়ে কত কথা শুনতে হচ্ছে আমায়।' ব'লে মলয় এক ঝলক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'অর্থাৎ ওদিকেও আমাদের বৌদি কড়া।' ড্যাবডেবে চোখে হাবুল আমার দিকে তাকাল।

'বিয়ে করেছিস ক'দিন?' জোনাকী আবার প্রশ্ন করল। 'চার বছর', বলল মলয়।

'উঁহু, মর্জিমত ছেলে হওয়া-না-হওয়া চলে, ব্রাদার, চাকরি হওয়া চলে না, তোমার মিসেসকে বলে দিও।' হাবুল এবার কেমন গজগজ ক'রে ওঠল।

'তোর বাসা কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বৌবাজার।' আঙুল দিয়ে বৌবাজারের দিকটা দেখিয়ে মলয় প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল। 'কাছেই, হেঁটে যাওয়া যায়, একদিন এসো না সব।'

একেবারে নিঃসঙ্গ। মানে বড় হবার পরও বিয়ে করে সংসারী হয়েও মলয় আমাদের ছেড়ে নিতান্ত একলা পড়ে গেছে, চেহারা দেখে বেশ বোঝা গেল। সামলাতে পারছে না বেচারা।

ছোটবেলায় ছোটখাটো বিপদে ও আমাদের অনেক সাহায্য চেয়েছে

পেয়েছে। আজ বড়রকম বিপদে ঠিক সাহায্য না হলেও, সান্ত্বনা ও সাহসের জন্যে যে ও তিনবন্ধুর মুখের দিকে তাকাবে যেন জানা ছিল না।

হেসে বললাম, 'বেশতো, এমনি তো বৌকে গিয়ে একদিন আমাদের দেখে আসা উচিত, কি বলিস জোনাকি, আজই যাওয়া যাক।'

'খালি হাতে?' হাবুল বলছিল।

'সে হবে।' জোনাকি সংশোধন করল। 'আবার যেদিন সুদিন হবে সেদিন না হয় ভরা হাতে গিয়ে বৌ দেখা যাবে। রোদে ঘুরে ঘুরে হয়রান সব। তবু যা হোক মলয়ের বাসা কাছে আছে, আড্ডা দেবার একটা জায়গা হ'ল।' কথার শেষে জোনাকি আমার মুখের দিকে তাকাল।

'সেই ভাল', বললাম, 'তা ছাড়া আজ যাচ্ছি ওর বৌকে দু'টো কড়া কথা শোনাতে, বোঝাতে যে যদি তুমি এমন অবুঝ হও বৌদি তো মলয়কুমার—'

'ঠিক কথা।' আমার কথা শেষ হবার আগে হাবুল হাঁকল, 'বাইরের অশান্তি সওয়া যায় ঘরের অশান্তি বড়ো সাংঘাতিক—'

'এসো, তোমরা এসে ওকে দেখিয়ে দাও, সংসারে আজ আমি একলা বেকার নই, আরো পুরুষ আছে, স্বামী—' মলয় উত্তেজনায় কাঁপছিল। 'পুরুষাকার ঠেস দিয়ে কথা বলছে বুঝি!' জোনাকি প্রশ্ন করল।

ঘাড় নেড়ে মলয় প্রশ্নের উত্তর দিল।

ট্র্যাফিক এড়িয়ে মলয়কে নিয়ে সন্তর্পণে ক্রসিং পার হ'য়ে তিনজন বৌবাজারের রাস্তা ধরলাম।

'যাই বলিস, কামাখ্যা', বেঁটে ঘাড় ঘুরিয়ে হাবুল আমায় বলছিল, 'আজকালকার মেয়েছেলের বাড়াবাড়ি এসব,—পুরুষাকার।'

'না, মলয়ের একটু শক্ত হওয়া উচিত' জোনাকি মন্তব্য করল, 'অন্তত কটা দিন—'

আমি বললাম, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা যাচ্ছি তো এই জন্যে। বোঝালে মঞ্জু খুব বুঝবে। দিনকাল এখন বড্ড খারাপ। গৃহিণীর এমন অসহিষ্ণু হলে চলে না।'

মলয় শুনল।

সারা রাস্তা বন্ধুদের কথা শুনল আর চুপ ক'রে রইল। অর্থাৎ আর যেন তার কিছু বলার দরকার ছিল না। মঞ্জু সম্পর্কে সব বলা হয়ে গেছে, মঞ্জুর মামলা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে ও খালাস।

মঞ্জুকে নিয়ে এবার আমাদের বুঝবার পালা।

মলয় বলল, 'বাঁ দিকে এসো।'

আমরা মলঙ্গা লেনের মধ্যে ঢুকলাম।

আ, কি বলব, কা'কে বলব।

কে বিশ্বাস করতো, কাকে আমরা বিশ্বাস করাতাম যদি না সেদিন—

বস্তুত মঞ্জুকে দেখেই আমাদের মনে হ'ল মলয় মিথ্যাবাদী।

মলয়ের কথায় বিশ্বাস ক'রে আমরা ঘোর অবিচার করেছিলাম এতক্ষণ মেয়েটির ওপর।

এই এতটুকুন, একটা পাখীর মতন, ছায়ছোট্ট ছটফটে হাসিখুশি মিষ্টি চেহারার মঞ্জু। চশমা চোখে। মাথায় প্রচুর চুল নেই কি মাথাটি তেমন বড় নয় বলে খোঁপা করা হয়নি, কুমারী বয়সের বেণী রয়ে গেছে।

আর তাতেই আরো বেশি আনাড়ী অপটু ঠেকছিল। যেন নতুন ঝক্‌ঝকে ছোট ফুটোওলা একটা ঝিনুকের বোতাম, খাপ খাওয়াতে পারছেনা আটকাতে পারছে না কিছুতে মলয় নামক একটি বড় ওভারকোটের গায়ে। খসে পড়ছে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে।

বেশি ঝক্‌ঝকে মনে হচ্ছিল মঞ্জুকে সারাক্ষণ পাকা ডালিম-দানার মতন গোলাপী-লাল মাড়ি বার ক'রে ও হাসছিল বলে।

হ্যাঁ, মঞ্জু, সেই মঞ্জু। এমন ছটাছুটি ক'রে আদর ক'রে তিনজনকে ঘরে তুলল, লাল মেঝেয় সুন্দর সুজনী বিছিয়ে বসতে দিলে, তারপর পরিচয় জানবার আগ্রহে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল মলয়ের দিকে যে আমরা কিছুতেই কেন জানি, বিশ্বাস করতে পারিনি মঞ্জুর ভয়ে মলয় সারা হয়ে যাচ্ছিল, চাকরি গেছে-না-গেছে পরদিন থেকে মেয়ে ধমকাচ্ছে স্বামীকে। অপটু। অনভিজ্ঞ। মঞ্জু যে অনেক বেশি অপটু।

বলব কি, বলতে বাধা নেই যদিও, মঞ্জুর কোলে মলয়ের ছেলেটাকে পর্যন্ত আমাদের চোখে কেমন বড় বড় ঠেক্‌ছিল। হ্যাঁ বছরে বড়।

ছোট্ট শরীর নিয়ে মঞ্জু সামলাতে পারছিল না খোকাকে, খোকাও বেশ কিছুক্ষণ ইলিবিলি, ক'রে শেষ পর্যন্ত বাপের কোলে মানে মলয়ের কোলে উঠতে পেরেই ঠাণ্ডা হ'ল, লক্ষ্য করলাম।

দেখে, মঞ্জু যেমন হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, আমরা তিনজনও হাল্কা বোধ করলাম।

আগন্তুকদের পরিচয়।

মলয় পরিচয় দেবার আগেই মঞ্জু তিনজনের পরিচয় আদায় ক'রে নিলো।

'আমি কামাখ্যা চক্রবর্তী, ইনি হাবুল হালদার, উনি জোনাকি সেন।' বললাম, 'আমরা মলয়ের বাল্যবন্ধু, অবিশ্যি বয়সে ও আমাদের কিছু ছোট।'

মঞ্জু নমস্কার করল।

'আমি আপনাদের বন্ধুপত্নী মঞ্জুমায়া।'

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রত্যেককে আলাদাভাবে মিনতিভরা নমস্কার জানাল মলয়-গিন্নী।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

যেন টের পাচ্ছিল মলয়।

সুজনীর এক ধারে হাল্কা হাঁটু দু'খানা মুড়ে মুখোমুখি হ'য়ে বসে মঞ্জু চোখের পলকে যখন আলাপ জুড়ে দিল তিনজনের সঙ্গে, মলয় বেশ বুঝতে পারল, রাস্তায় ও যে নানারকম কথা বলছিল, নিন্দা করছিল বৌ কী নিষ্ঠুরা হৃদয়হীনা ব'লে, বন্ধুপত্নীর সাক্ষাৎ দর্শনের পর বন্ধুরা তা আর এখন এক বর্ণ বিশ্বাস করবে না। লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে চুপচাপ ঘরের এক কোণায় একটা বেতের মোড়ার ওপর ব'সে ছেলেকে আদর করতে ছেলের মুখে চুষী-কাঠি গুঁজে দিতে ও ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে দেখলাম।

আড়চোখে মলয়কে দেখতে দেখতে তিনজন ভাবলাম, তবু ভাল ও যে ঘরে এসে বৌকে আর উচ্চবাচ্য করছে না।

কে বিশ্বাস করে, বলুন, কেউ যদি বলে যুঁইফুলের পাপড়ির ধারে হাত কাটে, চাঁদের আলোয় গা পুড়েছে?

এই মিষ্টি মেয়ের কথায় এক ফোঁটা ঝাঁজ নেই। জিভ থেকে কথা ঝরবার আগে হাসি ঝরছিল।

ওর চোখা বাক্যবাণে জর্জরিত হ'য়ে মলয় গরমে ধুলোয় চাকরির চেষ্টায় ড্যালহৌসী চষছিল তিনদিন ধ'রে, ঘরে ফিরতে ভয় পাচ্ছিল বৌ বকবে ভয়ে! মলয় মিথ্যাবাদী। মঞ্জুর ব্যবহারেই তা আমাদের বলে দিলো।

ওর স্বামী ছাড়াও জলজ্যান্ত আরো তিনটি বেকার ঘরে উপস্থিল ছিলাম। জোনাকির বা আমার না হোক হাবুলের বেশবাস দেখেই তা বোঝা যায়।

শেষবার হাবুলের যখন পান খেতে ইচ্ছা হ'য়েছিল, মোড়ের কাছে হঠাৎ পরিচিত পানের দোকান পেয়ে ও নাকি ধারে এক পয়সার পান কিনতে গেছিল। দোকানী হাবুলকে মাছি তাড়ানোর মত ফিরিয়ে দিয়েছিল। অথচ দশ বছর ধ'রে চাকরি হওয়ার দিন থেকে হাবুল ওর দোকানে রোজ দু'আনার করে পান খেয়ে এসেছে।

গল্পটা মুখে মুখে বলছিল হাবুল আসবার পথে। 'উড়ে দোকানীর দোষ কি, আমার এই চেহারা ও বেশভূষা দেখলে বেঁচে থাকলে গিন্নীই তেড়ে মারতে আসত। তোর তো বাবা দেখছি পায়ে জুতো থাকবে না দূরে থাক, মাথায় এক গাছি চুল এদিক সেদিক হয়নি এখনো, এর মধ্যেই বৌয়ের এত উত্তেজনা, হাঁসফাঁস? ভাল না।' হাবুল মলয়কে বোঝাচ্ছিল রাস্তায়। 'আমার অবস্থা যেদিন তোর হবে সেদিন দেখছি বৌ তোকে—'

অর্থাৎ হাবুল মঞ্জু সম্পর্কে একটা মারাত্মক মন্তব্য করেছিল। আপত্তি করার মতন।

এখন দেখা গেল কোথায় সেই মঞ্জু আর কোথায় এই মঞ্জু।

আকাশ পাতাল তফাৎ।

মলয়ের বর্ণনার সঙ্গে এক বিন্দু মিল নেই।

বরং আমরাই লজ্জিত হ'লাম।

জামার হাতায় মুখের ঘাম মুছছিল হাবুল, ছুটে গিয়ে হাতপাখা নিয়ে এল মঞ্জু। জোনাকি সিগারেট ধরাতে মলয়ের অ্যাশট্রে টেনে ওর পায়ের কাছে রাখল মঞ্জুমায়া, তারপর হাল্কা সোনার রঙের পা দুখানি মুড়ে আগের চেয়েও ঘন হয় বসল সুজনীর ওপর। হাসতে হাসতে বলল, 'শুধু মুখে আড্ডা জমবে কি, তাস, লুডো একটা কিছু হলে দুপুরটি কাটতো বেশ।'

যেন বহুদিন পর গায়ে বসন্তের হাওয়া লাগল।

বলছিলাম ক'জনের বৌ একথা বলে এদিনে।

বেকার স্বামীর বেকার সব বন্ধু।

সব জেনেই বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলার দিবাস্বপ্ন জেগেছিল মঞ্জুমায়ার।

বেকারদের বেকার, অকেজো ক'রে দেখতে নেই, তারা তা'তে চটে যায়, দুঃখ পায়, এই গূঢ়তত্ত্ব জানে মঞ্জুমায়া, যুঁইফুলের মত সব ক'টি দাঁত বের ক'রে ও হাসল, অর্ধেক দৃষ্টি স্বামীর দিকে রেখে অর্ধেক আমাদের দিয়ে বলল, 'অঙ্ক কষে কষে আপনাদের মলয়বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কি রকম, কি রকম।' আমরা আড়চোখে মলয়কে আর একবার দেখলাম। 'কি বলছিল ও?'

'তিন দিনেই ও চাকরি খুঁজে নেবে। আমি বলছি তিন মাস। তিনটি মাস তোমায় রোদে রোদে সাঁতার কাটতে হবে। দু'টো দিন সবুর করো। মন খারাপ ক'রে মাথা খারাপ ক'রে এখন থেকেই অত ছুটোছুটি করলে শরীর টেকে ক'দিন। অসম্ভব রোদ বাইরে। ঘরে থেকেই আমার চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে।' বাইরের দিকে এক চোখ আর একটি চোখ ঘরে, মানে আমাদের, বন্ধুদের মুখের ওপর মেলে ধরল মঞ্জুমায়া। 'সত্যি কিনা?'

মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

মলয় চুপ।

চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় ছিল কি ওর।

কিন্তু শেষ অবধি চুপ করেও ছিল না। আবার ভুল করল। ভুল নয় অবিচার, মঞ্জুর ওপর তো বটেই, আমাদের ওপরও। ঘরের সুন্দর আবহাওয়াটাই ভেঙ্গে দিলে ও। বেকার হবার পর থেকেই জোনাকি এক প্যাকেট তাশ পকেটে নিয়ে ঘুরত। কি জানি যদি এমন একটি আড্ডা পাওয়া যায়। বন্ধুরা তো বটেই যেখানে বন্ধুপত্নীও এক আধজন থাকবেন।

এবং ভেবে অবাক হচ্ছিল ও সত্যি এমন কোনো বন্ধুর গিন্নী কি এবাজারে আদৌ পাওয়া যাবে কিনা যিনি স্বামীর চাকরী গেছে জেনেও মুখ গোমড়া না ক'রে হাসছেন, ভেঙ্গে নুয়ে না পড়ে রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো সুন্দর শক্ত থেকে মাথা তুলে আছেন।

'আশা আলো দুঃসময়ের সাথী বলতে স্ত্রী ছাড়া পুরুষের কে আর আছে বলুন।' বিয়ে না ক'রেও বিবাহিতের মত সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথাগুলো বলছিল জোনাকি আর তাশের প্যাকেটটি মঞ্জুমায়ার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল এমন সময় বোকা মলয় কথা কয়ে ওঠল। 'এঁদের একটু চা-টা ক'রে দিলে হ'ত না?'

এক জোড়া আহত কালো চোখ আমাদের মুখের ওপর পাখা মেলে ধ'রে চুপ করে রইল। একটু পরে মঞ্জু একসময়ে মলয়ের দিকে মুখ ফেরাল। 'এক ফোঁটা দুধ চিনি ঘরে নেই।'

'তা বলতে হয়, না বললে আমি জানব কি ক'রে তোমার ভাণ্ডারে চায়ের দুধ চিনিরও টান ধরেছে।' তেরছা চোখে মলয় বৌয়ের দিকে না তাকিয়ে আমাদের দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, যেন বন্ধুদের সমর্থন খুঁজছিল ও তার নিজের

কথার জন্যে। আমরা চুপ ক'রে থাকিনি। তিনজন সমস্বরে গর্জন ক'রে ওঠলাম। 'তুই থাম, তুই চুপ কর গাধা।'

'বেশি প্র্যাক্টিক্যাল হয়েছিস, না?' জোনাকি বলছিল।

'ঘরে বন্ধু এলেই চা দিতে হবে তার কি অর্থ আছে।' হাবুল বলল।

'এসব পাট তুলে দে দিনকতক; বাজার বড় খারাপ।' আমি মলয়কে বোঝালাম। 'আমরা এসেছি বৌদির কাছে, তোর কাছে আসিনি।' জোনাকি বোঝাল। 'তুই তোর ছেলেকে আদর কর ততক্ষণ, একটা রাবার শেষ করি আমরা। আসুন বৌদি।'

কিন্তু যে-কথা বলা হয়েছে, যে-ঢিল ছোঁড়া হয়েছে তা আর ফিরিয়ে নেয় কে।

ঢিলের ঘায়ে ভেঙ্গে না পড়লেও নুয়ে গিয়েছিল রজনীগন্ধার ডাঁটা। নতমুখী মঞ্জুমায়া।

ঘরময় স্তব্ধতা।

মলয়ের ছেলের চুষি-কাঠি চোষা ও অদৃশ্য একটা টাইম্‌পীসের টুক্‌টুক্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না তখন।

'যাক্, যা হবার হয়েছে', অতল লজ্জা থেকে মঞ্জুমায়াকে টেনে তুলবার জন্যে সকলের আগে হাত বাড়াল, জোনাকি। পকেট থেকে একটা দু'আনি তু'লে মলয়ের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এর বেশি আমার সঙ্গে নেই, ওই দিয়ে যতটা হয় দুধ চিনি চট ক'রে তুই নিয়ে আয় মলয়।'

আমি বার করলাম একটা আনি। শশা কেনার পর ঐটেই পকেটের এক কোণায় থেকে ধুক্‌পুক্ করছিল।

পর্যন্ত হাবুল। অবাক হয়ে গেলাম দেখে ছেঁড়া কোটের কোন অংশ থেকে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা ডবল পয়সা বার করল ও। করতে পারল।

'যা আর দেরি করিসনে।' মলয়ের দিকে পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে হাবুল বলল, 'ওই দিয়ে যা হয় নিয়ে আয়।'

পয়সা কুড়িয়ে মলয় সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মুখে অল্প হাসি।

'সত্যি, ব্রাদার ভারি লজ্জা করছে আমার, এখানে, মানে আমার বাড়ীতে এসে আজ তোমরা—'

'নে আর ন্যাকামো করতে হয় না।' হাবুল ধমক দিল, 'যা বলছি আগে তাই কর্।'

'লাস্ট্ সেলারী মুদির বিল আর বাড়ীভাড়া মেটাতে গিয়ে—'

'সে আমরা জানি। পরিবার আমাদেরও আছে, বাড়ীভাড়া মুদির বিলের আওয়াজ রেখে তুই বেরিয়ে পড়্। ধারেকাছে দোকান পাবি তো?'

জোনাকির মুখের দিকে চেয়ে মলয় ঘাড় নাড়ল। 'তাশ শাফ্ল ক'রে তোমরা সুরু ক'রে দাও।'

'সে আমরা জানি, আমাদের খেলা আমরা বুঝব।' মলয়ের ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে জোনাকি মঞ্জুমায়ার মুখের দিকে তাকাল। 'কই, এসো বৌদি।'

রজনীগন্ধা ঘাড় সোজা করল।

'একেবারে নাবালক।' বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে আমিই মঞ্জুকে বোঝালাম, 'মলয়টা আর বড়ো হ'ল না।'

'যাক্‌গে, আমরা যখন এসে পড়েছি বৌদির আর কষ্ট নেই।' হাবুল জোরে জোরে পাখা চালাল।

জোনাকি বলল, 'তুমি আরো সামনে এসো মঞ্জু।' মলয়ের জুতোর শব্দ বাইরে মিলিয়ে যায়নি তখনো।

একটু পরে শুধু দুধচিনি নয়। একটা দেশ্লাই, এক পাতা চা নিয়ে মলয় ঘরে ঢুকল।

আমরা গম্ভীর, কেউ আর মুখ তুলিনি তখন।

খেলায় মত্ত, তথাপি হাবুল থুঁত্নি তুলে বলল, 'যা বাবা, চট্ ক'রে একটু জল ফুটিয়ে নিয়ে আয়।'

'সে আমি পারব, তাতে আর কষ্ট কি।' বুদ্ধিমান মলয়, মস্তিষ্ক-ভাল মলয় ঈষৎ হেসে উত্তর করল, 'তা ছাড়া তোমাদেরটাই তোমরা খাচ্ছো, এটুকুন যদি আমি না করলাম তো বন্ধু হ'লাম কি। এখুনি চা ক'রে নিয়ে আসছি।'

'সাবাস সাবাস!' আমরা চিৎকার ক'রে ওঠলাম।

অর্থাৎ মলয়ের ওপর তিল মাত্র আর রাগ ছিল না কারো। তাশ থেকে মুখ তুলে আড়চোখে জোনাকির চোখের দিকে চেয়ে মঞ্জুমায়া হাসছিল, হাসির ধমকে একটু একটু কাঁপছিল ও। আল্তো হাওয়ায় ফুলের ডাঁটা যেমন কাঁপে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা পাঁচজন মলয়ের মলঙ্গা লেনের কামরায় কমতেজী বাল্বের মন্দ আলোয় ব'সে ঠিক করে ফেললাম।

প্রস্তাব তুলেছিল মঞ্জুমায়া।

পরীক্ষার খাতায় মলয় ফি'বার অঙ্কে ফুল্-মার্ক পেয়েছিল কিন্তু সংসার-খরচের নির্ভুল হিসাব বার করে দেওয়া—

মঞ্জুমায়া পিছনে না থাকলে এতটা বুৎপত্তি মলয়ের জন্মাতো না, ভাবলাম।

মুখে মুখে হিসাব করল মলয় ও মঞ্জু। দেশলাই বাদ দিয় এগারো পয়সায় পাঁচ পেয়ালা চা।

আর সেই চায়ের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধের তুলনা ছিল না।

সুতরাং মঞ্জুর প্রস্তাবে আমাদের গররাজী হবার কোনো কারণ ছিল না।

কেনই বা থাকবে বলুন।

দু'মাসের টাকা বাকি, হোটেলের মালিক আমায় আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছিল রোজ। এতবড় পরিবারের খোরাক জোগানো দূরে থাক গ্যাসট্রিক আল্সারের রোগী বড়দা'র জন্যে এক ফাইল স্টমাক পাউডার কিনে দিতে পারছিল না ব'লে হাবুল ক'দিন ধ'রে বাড়ী ঢুকতে সাহস পাচ্ছিল না। জোনাকি বিলে বিলে জগত-সংসার অন্ধকার দেখে বুড়ো বাপ ও ছোট ভাইয়ের সামনে মুখ দেখানো বন্ধ করেছিল সাতদিন। এতক্ষণ চেপে রাখলেও মঞ্জুমায়ার কাছে সে কথাটা চাপতে পারল না।

'কিছু না। ক্রাইসিস কেটে যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।' মঞ্জু অভয় দিলে। 'দিন কতক এমনি কাটুক মন্দ কি।'

মলয় বললে, 'আমার ঘর ছোট, কিন্তু তোমরা তো পর নও, ব্রাদার, এক খাটিয়ায় চারজন রাতের পর রাত শুয়ে গল্প ক'রে কাটিয়েছি, মনে নেই?'

'আলবৎ মনে আছে, মনে না থাকলে তোর ডেরায় আমরা ছুটে আসব কেন? গদ্‌গদ্ গলায় হাবুল বলল। আমি বললাম, 'সময় আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল, কিন্তু মঞ্জুমায়া আমাদের এক ক'রে দিলে।'

'তা তোমরা বলতে পার,' যেন ঈষৎ ঈর্ষায় গলায় স্বর সরু ক'রে মলয় কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে বলল, 'কিন্তু আমি ঠিক চালাব, এই হিসাবমত সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে পারব, দেখো।'

'তোর হিসাবের ওপর আমাদের কোনোদিন অশ্রদ্ধা নেই।' তিন জন এক সঙ্গে জানিয়ে দিলাম।

বলব কি, সেদিনের পর থেকে আজ একটি মাস পার হয়েছে। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে মলয় আমাদের চালিয়ে নিচ্ছে। চালিয়ে নেওয়া ছাড়া কি!

বড়বাজার এক মেড়োর গদিতে একঘণ্টা ইংরেজী চিঠি টাইপ ক'রে ক'টাকা আমার রোজগার হয় বলুন। হাবুল কোথায় একটা ট্যুইসানি ক'রে পনেরোটি তন্‌থা পাচ্ছে। জোনাকি ক্যানিং ষ্ট্রীটের এক দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে টুকিটাকি জিনিসের দালালী করছে। এই।

অর্থাৎ আলাদাভাবে এই আয়ে আমাদের এক একজনের দু'বেলা জলখাবার জুটত, ভাত জুটত না।

অথচ এখানে এক সঙ্গে বেশ চলছে। রোববার, বিকেল পাঁচটা বাজে, মঞ্জুমায়ার গা ধোয়া হয়ে গেছে, চুল বাঁধছে, কাপড় চোপড় পরে জোনাকি হাবুল ও আমি অপেক্ষা করছি। সিনেমায় যাব মঞ্জুকে নিয়ে। মলয় একটু আগে মাংস নিয়ে এসেছে বাজার থেকে, ছেলে কোলে নিয়ে রান্নাঘরে ব'সে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে। এঘরে এসে একবার ও বলছিল তখন, 'পারব, খুব পারব আমি, দেখো। ফিরে এসে তোমরা গরম গরম মাংস পরোটা খাবে।'

আমরা কিছু বলিনি।

আমাদের হয়ে মঞ্জু উত্তর দিয়েছে।

'না পারার আছে কি, মন শক্ত করলে পৃথিবীতে কে কি না করতে পারে।'

চুল বাঁধা শেষ ক'রে মঞ্জুমায়া চোখে কাজল বুলোচ্ছিল। শিস দিতে দিতে জোনাকি বলল, 'তুমি আর দেরী করো না মঞ্জু, চট্ ক'রে সেরে নাও।'

কপাট

জাঁ পল সার্ত্র্

চরিত্র

পরিচারক	ইনিয়েজ
গার্স্যাঁ	এস্তেল

দৃশ্য

[সেকেণ্ড এম্পায়ার ধরণের বৈঠকখানা। তাকের উপরে গুরুভার ব্রোঞ্জের কারুকাজ করা মূর্তি রাখা]

গার্স্যাঁ : [পরিচারকের সঙ্গে প্রবেশ করে চারদিকে তাকিয়ে দেখে] হুঁ! তাহলে এই সেই ঘর?

পরিচারক : হাঁ, মঃ গার্স্যাঁ!

গার্স্যাঁ : ঘরটা এই রকম দেখতে?

পরিচারক : হাঁ।

গার্স্যাঁ : আসবাব পত্র দেখছি সেকেণ্ড এম্পায়ারের যুগের।...তা বেশ, সময়ে সবই গা সওয়া হয়ে যাবে।

পরিচারক : কারো হয়। কারো হয় না।

গার্স্যাঁ : সব ঘরই এই রকম?

পরিচারক : তা কি ক'রে হবে? কত ধরণের লোক আসে এখানে। ধরুন চীন অথবা ভারতের লোক। সেকেণ্ড এম্পায়ার যুগের চেয়ার তাদের কোন্ কাজে লাগবে?

গার্স্যাঁ : তা আমারই বা কি কাজে লাগবে? আমি কি ছিলাম তা ধারণা আছে তোমার?...থাক সে কথায় কাজ নেই! তাছাড়া খাপছাড়া ভাবে সাজানো কদর্য রুচির আসবাব পত্র সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে। সে সব ভালোই লাগতো শেষ পর্যন্ত। লুই ফিলিপের ডাইনিং রুমে একটা চেয়ার এদিক ওদিক হওয়া—এসব রুচির কথা জানা আছে

তো?—যাই হোক তার তবু একটা সঙ্গতি ছিল! যেমন যুগ তেমন রুচি!

পরিচারক: সেকণ্ড এম্পায়ার ধাঁচের বৈঠকখানাতেও থাকতে থাকতে সঙ্গতি খুঁজে পাবেন।

গার্স্যাঁ: বটে?···হ্যাঁ; হ্যাঁ, তা হয়তো পাবো। [আর একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে] কিন্তু, যাই হোক জায়গাটা দেখতে যে এরকম হবে মোটেই কিন্তু ভাবিনি! এ বিষয়ে সাধারণত কী ধারণা প্রচলিত আছে জানো তো?

পরিচারক: কোন্ বিষয়ে?

গার্স্যাঁ: [হাতের ভঙ্গীতে চারদিকে দেখিয়ে]—মানে এই জায়গার বিষয়ে!

পরিচারক: আচ্ছা, সেই সব গাল্-গল্পে আপনারা বিশ্বাস করতেন কি করে? যারা এ জায়গার ছায়া কোনোদিন মাড়ায় নি তাদের কথার দাম কি? তারা যদি সত্যি কখনো ঢুকতো এখানে তাহলে—

গার্স্যাঁ: ঠিক, ঠিক! [দুজনেই হাসলো। হঠাৎ হাসি মুছে গেল গার্স্যাঁর মুখে] কিন্তু, তোমাদের এখানে যন্ত্রণা দেওয়ার যন্ত্রপাতি সব কোথায়?

পরিচারক: কী সব?

গার্স্যাঁ: টক্‌টকে লাল সাঁড়াশী, টানা দেওয়ার খুঁটি, শাস্তি দেওয়ার আরো সব নানারকমের পন্থা—কোথায় সে সব?

পরিচারক: আজ্ঞে, রসিকতা করছেন আমার সঙ্গে, তা করুন।

গার্স্যাঁ: রসিকতা মনে হচ্ছে? কিন্তু রসিকতা করছি না। [একটু চুপচাপ। ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করে এসে] একখানাও আয়না নেই! একটাও জানালা নেই! এইখানে তাহলে বসে অপেক্ষা করতে হবে! নেই এমন একটা জিনিস যা ভাঙা যায়! [রাগে ফেটে পড়ে] চুলোয় যাক সব, কিন্তু আমার টুথব্রাসটা অন্ততঃ আনতে দিলো না কেন?

পরিচারক: বেশ বলেছেন! এখনো তাহলে আপনার—সেই কি বলে?—মানব জন্মের মান সম্মান বোধ মরে নি? হাসছি বলে ক্ষমা করবেন!

গার্স্যাঁ: [আর্মচেয়ারের হাতলে রেগে একটা চাপড় মেরে] শিষ্টতা শেখো! কোথায় এসেছি জানি, কিন্তু তাই বলে কিছুতেই সহ্য করব না যদি—

পরিচারক: দুঃখিত! দোষ নেবেন জানলে বলতুম না। কিন্তু দেখুন, যে আসে সে ঐ এক কথাই জানতে চায়! অপরাধ ধরবেন না, কিন্তু

দেখুন তো কী নির্বোধের মত প্রশ্ন! কী? না, যন্ত্রণা দেওয়ার ঘর কোনটা? এক আধজন না, প্রত্যেকের মুখে সবচেয়ে আগে ঐ প্রশ্ন। বাথরুমে কি কি আছে না আছে তা নিয়ে প্রথমে কারো চিন্তা দেখিনা। তারপরে একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে তখন এটা কোথায়, সেটা কোথায়, টুথব্রাস কোথায়, তার খোঁজ পড়ে! কী আশ্চর্য কাণ্ড, মঃ গার্স্যাঁ! মস্তিষ্কের একটু ব্যবহার করলেই তো হয়! জিজ্ঞেস করি, এখন আর দাঁত মেজে হবে কি?

গার্স্যাঁ: [আরো শান্ত ভাবে] ঠিক, ঠিকই বলেছ! [আবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে] এখন আর আয়নায় মুখ দেখারই বা কি দরকার? কিন্তু তাকে রাখা ঐ যে ব্রোঞ্জের বস্তুটি—ওটার উদ্দেশ্য? ওটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ দুটো ভাঁটার মতো একদিন ঠেলে বেরোবো বলেই হয়তো! ঠেলে বেরিয়ে আসবে দুটো চোখ—কী বল? শোনো, আর লুকিয়ে লাভ কি? মনের কথা খুলেই বলা যাক! আমার অবস্থা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি! কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে—একটা লোক যেন জলে ডুবছে, বদ্ধ হয়ে আসছে দম, তলিয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। শেষে চোখ দুটো জেগে আছে জলের বাইরে। তখন সে কী দেখতে পাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছে ব্রোঞ্জের বীভৎস একটা বস্তু—কী না লোকটার নাম?—হ্যাঁ বার্বদিয়ে—সেই লোকটার হাতের কাজ! একখানা সংগ্রহ বটে! যেন দুঃস্বপ্নে দেখা! ওটা রাখার এই তো অভিপ্রায়?···ও বুঝেছি কোনো কথার জবাব দেবে না। নিষেধ আছে। বেশ, আমিও জোর করছি না। কিন্তু, দেখ, আমার কপালে যে কী আছে তা আমি বেশ জানি। অতর্কিতে যে তোমরা স্তম্ভিত করে দেবে—সে কথাটিও ভেবো না। কি ঘটে আমি দেখতে চাই—নির্ভয়ে দেখতে চাই। [প্রকোষ্ঠে পায়চারি করতে করতে] যাক, বোঝা গেল, টুথব্রাস তাহলে হবে না! শোয়ার বিছানাও নেই! কেউ ঘুমোয় না এখানে, তাই না?

পরিচারক: ঠিক ধরেছেন।

গার্স্যাঁ: যা ভেবেছিলাম হুবহু মিলে যাচ্ছে! ঘুম আর কেন? একটু তন্দ্রার মতো ঘোর লাগবে, কানের পাশে শির শির করে উঠবে, মনে হবে চোখের পাতা বুজে আসছে—কিন্তু ঘুম হবে না? সোফায় উঠে শোও—নিমেষে পালিয়ে যাবে ঘুম। পালিয়ে যাবে অনেক মাইল

পার হয়ে! চোখ রগরাও, উঠে বসো, আবার আগের মতো ঢোলো।

পরিচারক : মনোরম কল্পনা শক্তি আছে আপনার!

গার্স্যাঁ : তুমি থামো! ·····হৈ চৈ করতে চাইনা আমি, যা হয় হোক, এতটুকু ক্ষোভ নেই। ঐ যা বললাম, নির্ভয়ে দেখতে চাই কি ঘটে। মনে কোনো সংশয় নেই! আচমকা অপ্রস্তুত করে দেবে, তার সময়ই দেব না, দেখে নেব এমন কি ঘটতে পারে! একে তুমি বলো 'মনোরম কল্পনা ?'···যাক্‌গে বোঝা গেল যে এখানে বিশ্রামের পাট নেই। চোখে যদি ঘুমই না এলো ঘুমের তাহলে আর দরকার কি ? বেশ যুক্তি আছে কথাটার মধ্যে, কি বল ? রোসো, কি যেন একটা গোলমাল লাগছে, অস্বস্তিকর লাগছে। কিন্তু অস্বস্তিকর লাগছে কেন ?···জীবনে এখানে বিরাম নেই—বৈচিত্র্য নেই তাই কি ?

পরিচারক : কী অর্থে বলছেন ?

গার্স্যাঁ : কী অর্থে বলছি ? [সংশয়ের চোখে পরিচারকের দিকে তাকিয়ে] যা ভেবেছিলাম তাই! যতবার এদিকে তাকাচ্ছো ততবার তোমাকে জানোয়ারের মতো কুৎসীৎ অশ্লীল লাগছে—এইজন্য ? তোমার চোখ অবশ!

পরিচারক : বলছেন কী এ সব ?

গার্স্যাঁ : পলক নেই তোমার চোখে! আমাদের চোখের পাতা চঞ্চল, একবার নামে, আবার ওঠে। লোকে বলে 'পলক' পড়লো। কালো একটুকরো পর্দা টুক্ করে চোখের মধ্যে নেমে আসে, অমনি এক নিমেষের বিরতি। দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে যায়, চোখ ভিজে ওঠে। বুঝবে না তুমি কতো শান্তি, কতো তৃপ্তি এই অবকাশটুকুর মধ্যে। ঘণ্টায় চার হাজার বার এমনি পলক ফেলার অবকাশ! চার হাজার পলকের ছুটি। একবার শুধু ভাবো।···চোখের পলক না ফেলে তাহলে বাস করতে হবে এখানে। ন্যাকা সেজোনা, দুর্বোধ্য কথা কিছু বলি নি! এখানে ঘুম নেই, কারণ এখানে পলক নেই চোখে : অতি সহজ যুক্তি, এই তো ? আমার চোখে আর ঘুম আসবে না! কিন্তু তাহলে—নিজের অস্তিত্বের সঙ্গ আমি সহ্য করব কি করে ? কি করে সহ্য করব ? অন্যকে অতিষ্ঠ করে তুলতে অবশ্য ভালো লাগে আমার, সে আমার

স্বভাব। এমন কি নিজেকে পর্যন্ত অতিষ্ঠ করে তুলি। জ্বালাতন করে মারি নিজেকেই! ব্যাপারটা মোটেই ভদ্র হয়না। তা'বলে লোককে শুধু ক্রমাগত জ্বালাতন করাও তো যায় না! ওখানে আমার রাত্রিগুলো পেতুম। তখন ঘুম হোতো। ঘুম আমার বরাবরই ভালো হয়। তাতেই হয়তো লোকসান পুসিয়ে যেতো। আর থাকতো খণ্ড খণ্ড সুখের স্বপ্ন। সবুজ একটা প্রান্তরের কথা মনে পড়ে। নিতান্ত সামান্য একখণ্ড মাঠ। সেই মাঠে একদিন আমি কতো ঘুরেছি।··· আচ্ছা, এখন দিন না রাত ?

পরিচারক : দেখছেন না ? আলো জ্বালানো র'য়েছে।

গার্স্যাঁ : ও, বুঝেছি। এখন হচ্ছে তোমাদের এখানকার দিন, না ? আর বাইরে ?

পরিচারক : বাইরে মানে ?

গার্স্যাঁ : আঃ শয়তানী ছাড়ো, বুঝেছ ? বেশ জানো আমার প্রশ্নের মানেটা কী ? বাইরে মানে দেয়ালের ওদিকে ?

পরিচারক : দেয়ালের ওদিকে বারান্দা।

গার্স্যাঁ : বারান্দার শেষে ?

পরিচারক : আরো ঘর, আরো বারান্দা, আরো সিঁড়ি।

গার্স্যাঁ : তার ওপারে ?

পরিচারক : ব্যস্, এই।

গার্স্যাঁ : তুমি তো কখনো কখনো ছুটি পাও ? তখন যাও কোথায় ?

পরিচারক : যাই আমার কাকার ওখানে। কাকা এখানকার পরিচারকদের কর্তা কিনা ? চারতলায় উঠে তার ঘর।

গার্স্যাঁ : বোধ হয় তাই হবে! আচ্ছা, আলোর সুইচ্‌টা কোথায় ?

পরিচারক : সুইচ্ নেই।

গার্স্যাঁ : মানে ? আলো কি তাহলে নেবানো যায় না ?

পরিচারক : ওঁদের ইচ্ছে হলে নিজেরাই লাইন কেটে দেবেন। কিন্তু বাড়ীর এ তলায় কোনো দিন আলো নিবেছে বলে আমার স্মরণ হয় না। আমাদের তো বিদ্যুতের অভাব হয় না কিনা!

গার্স্যাঁ : দু'চোখের পাতা এক না করে দিনের পর দিন তাহলে বাঁচতে হবে এখানে ?

পরিচারক : কি বললেন ? বাঁচতে হবে—বললেন না ?

গার্স্যাঁ : কথার সাট ধোরো না। চোখের তাহলে, পলক পড়বে না! চিরকাল! চিরকাল এই উলঙ্গ দিনের আলো আমার চোখের সামনে জ্বলবে—মস্তিকের কোষে কোষে নেচে বেড়াবে। [একটু চুপচাপ] তাক থেকে নামিয়ে ব্রোঞ্জের ঐ বীভৎস জিনিষটা যদি আলোর দিকে ছুঁড়ে মারি ? তাহলেও কি নিববে না ?

পরিচারক : নড়াতেই পারবেন না! দারুণ ওজন ওটার।

গার্স্যাঁ : [ব্রোঞ্জের জিনিসটা দু'হাতে তোলার চেষ্টা করে] তাই দেখছি। ভীষণ ভারী। [দুই জনেই নীরব]

পরিচারক : আমার আর প্রয়োজন না থাকলে, অনুমতি করুন, আমি এবার যাই।

গার্স্যাঁ : সে কি ! তুমি যাবে ? [পরিচারক দরজা অব্দি গেল] থাকো আর একটু। [পরিচারক ফিরে তাকালো] ওটা কি ঘন্টা নাকি ? [পরিচারক উপরে নীচে মাথা নাড়লো] ঘন্টা বাজালে তো আসতেই হবে তোমাকে, না ?

পরিচারক : তা—হ্যাঁ, বলতে গেলে তাই ! কিন্তু ঘন্টা কখন বাজবে কে জানে। ইলেকট্রিক তারে কোথাও গোলমাল আছে, সব সময় ওটা বাজে না। [গার্স্যাঁ ঘন্টার বোতাম টিপলো, পিড়িং পিড়িং আওয়াজ হোলো বাইরে]

গার্স্যাঁ : এই তো চমৎকার বাজে।

পরিচারক : [সবিস্ময়ে] তাই তো দেখছি ! [সে নিজেও বোতাম টিপলো] কিন্তু আমি হলে এতেও নিশ্চিন্ত হতে পারতুম না। ঘন্টাটা—খেয়ালী। যাক এবার যাই। [গার্স্যাঁ হাতের ইসারায় তাকে থামালো] বলুন আর কি ?

গার্স্যাঁ : না, কিছু না। এমনি ! [স্টোভের মাথার তাক থেকে একটা কাগজ কাটা ছুরি তুলে নিয়ে] এটা কি ?

পরিচারক : দেখতে পাচ্ছেন না, কাগজ কাটা ছুরি ?

গার্স্যাঁ : এ ঘরে বইটই আছে ?

পরিচারক : নেই।

গার্স্যাঁ : এটা তাহলে কোন কাজে লাগে ? [পরিচারক অধৈর্যের সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকালো] আচ্ছা, যাও তুমি। [পরিচারক বেরিয়ে গেল]

[একা গার্স্যাঁ। ব্রোঞ্জের মূর্তিতে চিন্তামগ্ন ভাবে বারকয়েক হাত বুলালো। একবার বসল, আবার উঠে দাঁড়ালো, ঘন্টার দিকে এসে বোতাম টিপলো একবার। ঘন্টা নীরব। দু'তিনবারের চেষ্টাতেও ফল হোলো না। তখন কপাট খোলার চেষ্টা করে দেখলো তাও সম্ভব না। পরিচারককে চেঁচিয়ে ডাকলো কয়েকবার। সাড়াশব্দ নেই। ডেকে ডেকে দুম্ দাম্ কিল মারতে লাগলো কপাটে। তারপর হঠাৎ শান্ত হয়ে আবার এসে বসে পড়লো। ঠিক সেই মুহূর্তে কপাট খুলে গেল। ইনিয়েজে-র পিছনে পরিচারক ঘরে ঢুকলো।]

পরিচারক : আমাকে ডাকছিলেন ?

গার্স্যাঁ : ['হ্যাঁ' কথাটা ঠোঁটের আগে এসে গিয়েছিল। এমন সময় ইনিয়েজে-র প্রতি চোখ পড়তেই] নাঃ।

পরিচারক : [ইনিয়েজে-র দিকে তাকিয়ে] এই আপনার ঘর। [ইনিয়েজ নির্বাক] কিছু যদি জানার থাকে তাহলে বলুন [তবু ইনিয়েজে-র মুখে কথা নেই। পরিচারক খাপ্পা হোলো] যারা আসেন সকলেই অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তা আপনার দরকার না থাকলে বেশ কথা। যাই হোক, টুথব্রাস, দরজার ঘন্টা অথবা স্টোভের মাথায় তাকে ঐ ব্রোঞ্জের বস্তুটা—এ সব বিষয়ে এই ভদ্রলোকই সব বলতে পারবেন। আমাদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ একটু আলোচনা হয়ে গেছে। [পরিচারক প্রস্থান করলো। ইনিয়েজ ঘুরে ঘুরে ঘর দেখতে লাগলো। গার্স্যাঁ তার দিকে তাকালো না। হঠাৎ গার্স্যাঁর দিকে অতর্কিতে ফিরে দাঁড়িয়ে]

ইনিয়েজ : ফ্লোরেঁস কোথায় ? [গার্স্যাঁ নিরুত্তর] শুনতে পাচ্ছো না ? ফ্লোরেঁস কোথায়, জিজ্ঞেস করছি। কোথায় রেখেছ তাকে ?

গার্স্যাঁ : আমি কি করে জানবো !

ইনিয়েজ : ও, এই উপায় বের ক'রেছ তোমরা ? আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ এনে যন্ত্রণা দেবে, না ? বেশ, চেষ্টা ক'রে দেখ। অত সহজে এলিয়ে পড়ার মেয়ে আমি নই। ফ্লোরেঁস-এর বোকামিতে বরং আমার গা জ্বলে যেত। তাকে সরিয়ে নিলে তো বাঁচলাম আমি !

গার্স্যাঁ : একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ! আমি কে বলে ভাবছেন বলুন তো ?

ইনিয়েজ : তুমি ? যার হাতে আমার যন্ত্রণা পাওয়ার কথা তুমি সেই, আবার কে ?

গার্স্যাঁ : [শুনে প্রথমে চমকে উঠলো, তারপরে ফেটে পড়লো হাসিতে] চমৎকার, চমৎকার পরিহাস। যন্ত্রণা দেব—আমি ? ঘরে ঢুকে—আমার দিকে একবার

তাকিয়েই বুঝে ফেললেন যে আমি—কী বলে—এখানকারই কোনো লোক? না? ঐ নির্বোধ লোকটার ক্রটির জন্যই এটা হয়েছে! ওর উচিৎ ছিল আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমি হলাম শান্তিদাতা? বটে! দেখুন, আমি হচ্ছি জোসেফ গার্স্যাঁ, পেশা সাংবাদিকতা, জাতে সাহিত্যিক। বলতে গেলে এক নৌকোয় দু'জনেই যখন চড়েছি পরিচয়টা হয়ে যাক। আপনি হলেন মিসেস্—

ইনিয়েজ : [বিরক্তির সঙ্গে] 'মিসেস্' কিসের? আমি বিয়ে করিনি।

গার্স্যাঁ : তাতে কি? তবু পরিচয় হয়ে গেল! শীতল বরফ যদি গললোই, তাহলে এবার বলুন তো, যন্ত্রণাদাতার মতো নিষ্ঠুর কি আমাকে সত্যি দেখাচ্ছে? তাছাড়া একবার দেখেই কি করে যন্ত্রণাদাতাদের চেনা যায় সে কথাও শুনি। দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে আপনার।

ইনিয়েজ : তাদের দেখতে আতঙ্কিত মনে হয়।

গার্স্যাঁ : আতঙ্ক! কী হাস্যকর! তাদের আবার আতঙ্ক কী দেখে? যাদের তারা যন্ত্রণা দেয় তাদের দেখে?

ইনিয়েজ : হাসতে চান হাসুন! কিন্তু আমি আন্দাজে বলিনি! আয়নায় কতোবার নিজের মুখ কি দেখিনি আমি?

গার্স্যাঁ : আয়নায়? [চারদিকে চোখ বুলিয়ে] কী নির্দয় পশু এরা। আয়না, —আয়নার মতো দেখতে সব কিছু সরিয়েছে ঘর থেকে। [একটু চুপচাপ] যাক্, জেনে রাখুন আমি একটুও আতঙ্কিত নই। তাই বলে বিপদের গুরুত্ব দিচ্ছিনা, ভাববেন না। বরং গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে পড়া গেছে তা স্বীকার করছি। কিন্তু তাবলে ভয়ে বিহ্বল হইনি।

ইনিয়েজ : [কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে] তাতে আমার কী? [একটু থেমে] কিন্তু আপনি ঘরেই বসে থাকবেন নাকি? বাইরে এক আধবার ঘুরে টুরে আসতেও তো পারেন।

গার্স্যাঁ : কপাটে তালা যে!

ইনিয়েজ : আঃ—কী জ্বালাতন!

গার্স্যাঁ : আমি থাকায় আপনার বিরক্তি লাগারই কথা। আমিও—দেখুন, খোলাখুলি বলা যাক—আমিও এখানে একা থাকলেই সুখী হতুম! আগা-গোড়া সব কিছু একবার ভেবে দেখা যেতো। এলোমেলো জীবনকে গোছ-গাছ করে নেওয়া যেতো। একা হলেই এতে সুবিধা—তা বুঝতে

পারছেন। যাই হোক একত্র থেকেও কোনো রকমে সেটা করে ওঠা যাবে। নিজে আমি তেমন আলাপী নই, ছট্‌ফট্ করতেও ভালো লাগে না; মানে নিরিবিলি শান্তিপ্রিয় লোক! সঙ্কোচ হলেও একটা প্রস্তাব করি, পরস্পরে আমরা খুব ভদ্র ব্যবহার করব—এই সর্ত করা যাক। দুজনেরই তাতে ক্লেশের লাঘব হবে।

ইনিয়েজ : ওসব ভদ্রতা—আমার ধাতে নেই।

গার্স্যাঁ : আমার যেটুকু আছে তাতেই দু'জনের পুষিয়ে যাবে।

[দীর্ঘ নীরবতার ভাব। গার্স্যাঁ সোফায় বসে আছে। ইনিয়েজ ঘরের এদিকে ওদিকে ঘুরছে]

ইনিয়েজ : [গার্স্যাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে] ওকি ভঙ্গী হচ্ছে মুখের?

গার্স্যাঁ : [যেন ঘুম থেকে চম্‌কে উঠে] ক্ষমা করবেন।

ইনিয়েজ : চুপচাপ শান্ত থাকতে পারেন না? মুখে কত রকম ভঙ্গী হচ্ছে—দেখলে হাসি পায়!

গার্স্যাঁ : লজ্জিত। বুঝতে পারিনি।

ইনিয়েজ : বুঝতে পারেন না সেটাই তো দোষ আপনার। [গার্স্যাঁর মুখ আবার কুঞ্চিত হোলো] ঐ আবার! নিজের মুখ নিজের দখলে নেই, আপনি আবার শিষ্টতার কথা বলেন! দেখুন এখানে আপনি একা নেই! বসে বসে আমাকে যে আপনার আতঙ্কের দৃশ্য দেখাবেন—সেটা হবে না।

গার্স্যাঁ : [উঠে ইনিয়েজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো] আর আপনি? এখানে এসে আপনার আতঙ্ক হচ্ছে না?

ইনিয়েজ : এখন আর আতঙ্কে লাভ কি? ছিল একদিন—ভয় পাওয়ার যখন অর্থ হোতো। যখন আশা করার বাকি ছিল কিছু!

গার্স্যাঁ : [নীচু গলায়] এখন, সত্যি, আর আশা নেই—তবু কিছুই তো সুরু হয় নি এখনো! এখনো আমাদের শাস্তির সময় আসে নি।

ইনিয়েজ : ঠিক। [দু'জনেই একটু নীরব কিন্তু, আমাদের নিয়ে এরা কী করবে বলুন তো?

গার্স্যাঁ : কিছুই জানি না। দেখি কি হয়!

[আবার চুপচাপ। গার্স্যাঁ সোফায় ফিরে গেল। ইনিয়েজ পায়চারি করতে লাগলো ঘরে!

গার্সঁ্যার মুখ কুঞ্চিত হোলো একবার ; ইনিয়েজের দিকে একবার চোখ তুলেই তক্ষুনি সে দুহাতে মুখ ঢাকলো। পরিচারকের সঙ্গে এস্তেল্ প্রবেশ করলো এসে। গার্সঁ্যা তখনো হাতে মুখ গুঁজে বসে। এস্তেল্ সে দিকে তাকিয়ে]

এস্তেল : [গার্সঁ্যাকে] না-না, মুখ তুলে তুমি তাকিও না। জানি হাত চাপা দিয়ে কী তুমি লুকিয়ে রেখেছ! জানি ওখানে তোমার মুখের তো আর চিহ্ন নেই। [গার্সঁ্যা মুখ থেকে হাত সরালো] এ কি! [পলকের স্তব্ধতা। তারপর বিস্ময়ের স্বরে] তুমি কে! তোমাকে তো চিনি না!

গার্সঁ্যা : মাদাম, আমাকে আপনার শান্তিদাতা ভাববেন না।

এস্তেল্ : তা কেন ভাবতে যাবো! আমি—আমি ভেবেছিলুম অযথা আমাকে লাঞ্ছনা করতে কেউ এখানে বসে আছে। [পরিচারকের প্রতি] আর কেউ আসছে না এ ঘরে?

পরিচারক : আজ্ঞে না, আর কারো আসার কথা নেই।

এস্তেল : ও! এখানে শুধু আমরা তিন জনেই থাকব? এই ভদ্রলোক, এই মহিলা আর আমি? [ফেটে পড়লো হাসিতে]

গার্সঁ্যা : [রেগে উঠে] হাসির কি আছে এর মধ্যে!

এস্তেল : [হাসি না থামিয়েই] সোফাগুলোর চেহারা দেখুন! কি জঘন্য দেখতে, না? সাজিয়েছে—তারই বা কি ছিরি! নিউ ইয়ার্স-ডের কথা মনে পড়ে—বুড়ি পিসির বাড়ী একবার যেতে হোতো সেদিন। দুমিনিটে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, সে এমন বুড়ি। বাড়ীটাও এই রকম কুৎসিৎ জিনিসপত্রে ঠাসা। ...এখানে যার যার একটা একটা সোফাতো? ঐটে বুঝি আমার? [পরিচারকের প্রতি] এ রকম সোফায় বসা যায় নাকি? বীভৎসতা দেখে মুখে আমার কথা সরছেনা। ফিকে নীল পোশাকে ঐ ক্যাট্‌কেটে সবুজ সোফা!

ইনিয়েজ : তুমি আমারটায় বসবে ভাই?

এস্তেল : লাল্‌চে মদ রঙেরটায়? খুব ভালো তুমি। কিন্তু নাঃ—ওটাও এমন আর কি চমৎকার! থাক্‌গে—মন খারাপ করে লাভ কি। যে যা পাই সেটাই মেনে নিতে হবে। সবুজটাই আমার থাক। [একটু চুপ] তবে ঐ ভদ্রলোকের সোফাটা হলে মন্দ হোতো না।

[আবার চুপ]

ইনিয়েজ : মঃ গার্সঁ্যা কি শুনতে পান নি?

গার্সঁ্যা : [ঈষৎ চমকে উঠে] ওঃ—এই সোফার কথা বলছিলেন নাকি? সত্যি লজ্জিত! [দাঁড়িয়ে] নিন আপনি এটা।

এস্তেল : ধন্যবাদ। [কোট খুলে সোফাটায় রাখলো। আবার একটু চুপচাপ] এক ঘরেই থাকতে হবে যখন আসুন আমাদের পরিচয়টা হয়ে থাক। আমার নাম রিগোল। এস্তেল রিগোল। [গার্সঁ্যা ঘাড় নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছে, ইনিয়েজ তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো]

ইনিয়েজ : আমি হলাম ইনিয়েজ সেরানো। পরিচয় হওয়ায় সুখী হলাম।

গার্সঁ্যা : [নতুন ক'রে অভিবাদন করে] আমি জোসেফ্ গার্সঁ্যা।

পরিচারক : আর কি আমার থাকার দরকার আছে?

এস্তেল : না, তুমি যাও। দরকার হয় ঘণ্টা বাজাবো।

[সকলকে বিনীতভাবে অভিবাদন করে পরিচারক বেরিয়ে গেল]

ইনিয়েজ : চমৎকার দেখতে তুমি ভাই। তুমি এলে, কিছু ফুল থাকলে বেশ হোতো।

এস্তেল : ফুল? সত্যি! ফুল আমি খুব ভালোবাসতুম। এখানে কিন্তু দেখতে দেখতে ফুল শুকিয়ে উঠবে, তাই না? দম আটকে আসে, একটু হাওয়া নেই! কিন্তু যাই ঘটুক, আমরা হাসিখুশী থাকতে পারলেই অনেকটা বিপদ কেটে যাবে, কি বলেন? অবশ্য আপনারাও—

ইনিয়েজ : হ্যাঁ। গেল সপ্তাহে। তুমি?

এস্তেল : আমি—এইতো কাল। এখনো হাঙ্গামা শেষ হয়নি। [যেন সদ্য সদ্য দেখতে পাচ্ছে এইভাবে বর্ণনা করতে লাগলো। কণ্ঠ বেশ স্বাভাবিক] ঐ আমার বোনের ওড়না হাওয়ায় কেমন ফুলে ফুলে উঠছে। খুব চেষ্টা করছে চোখে দুফোঁটা জল আনতে। দেখি, দেখি বাছা, আর একটু চেষ্টা করো! বাঃ এই তো! এইতো দুফোঁটা জল, ছোট্টো দুটি জলের কণা কালো ওড়নার নীচে কেমন চিক্ চিক্ করছে। ওমা, সকালে আজ ওল্‌গাকে কি রকম দেখাচ্ছে! আমার বোনের হাত ধরে কেমন নিয়ে চলেছে দেখো! ওর চোখে কিন্তু জল নেই। দোষ দিই নে। কান্নায় ভেজা মুখের যা চেহারা হয়! জানেন, ওল্‌গা ছিল আমার প্রাণের বন্ধু।

ইনিয়েজ : শেষ সময়ে খুব কি কষ্ট হয়েছিল তোমার ?

এস্তেল : নাঃ। বলতে গেলে প্রায় সময়েই আমার ঠিক জ্ঞান ছিল না।

ইনিয়েজ : কী হয়েছিল ?

এস্তেল : নিউমোনিয়া। [আবার আগের স্বরে] হয়ে গেল। ঐ ওরা কবর ছেড়ে চলে আসছে। বিদায়! বিদায়! বেশ লোক হ'য়েছে তো। আমার স্বামী আসতে পারেন নি। বাড়ীতেই শোকে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বেচারা! কষ্ট হয়। [ইনিয়েজকে] আপনার কি হয়েছিল ?

ইনিয়েজ : গ্যাসের ষ্টোভ থেকে।

এস্তেল : মঃ গার্স্যাঁ আপনার ?

গার্স্যাঁ : পাঁজরা ফুটো ক'রে বারোটা বুলেট। [এস্তেল আতঙ্কে শিউরে উঠলো] লজ্জিত হচ্ছি। মৃতের জগতেও আমার সঙ্গ হয়তো সুখের না।

এস্তেল : দোহাই, দোহাই আপনার, ও শব্দটা আর উচ্চারণ করবেন না। এমন অশ্লীল কথা ওটা। তাছাড়া কিছু মানে হয়না শব্দটার। এখনই বরং আমার মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি এবার বেঁচে উঠেছি। দেখুন, যদি এসব কথা—আর কি আমাদের এই অবস্থার কথা ওঠেই তবে না হয় নিজেদের আমরা উল্লেখ করবো—দাঁড়ান—বেশতো আমরা 'নিরুদ্দেশ' হয়েছি বলা যাবে। আপনি কি—অনেক দিন. হয় 'নিরুদ্দেশ' হয়েছেন ?

গার্স্যাঁ : তা একমাস হবে !

এস্তেল : কোথায় থাকতেন ?

গার্স্যাঁ : আমি ছিলুম রিও-তে।

এস্তেল : আমি প্যারিসে ! আর কে কে ছিল আপনার ?

গার্স্যাঁ : স্ত্রী ছিল। [এস্তেল-এর আগেকার স্বরে] ঐ যে ব্যারাকের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। রোজ ওখানে আসে। কিন্তু ওরা ঢুকতে দেয়না। গরাদের ফাঁকে ভিতরে দেখার চেষ্টা করছে। ওতো জানেনা যে আমার—মানে আমি 'নিরুদ্দেশ'। কিন্তু সন্দেহ হয়েছে। ঐ চলে যাচ্ছে। আজো সেই কালো পোষাকে এসেছিল। ভালোই, পোষাক আর পাল্টাতে হবে না। চোখে কান্না নেই, কিন্তু কোনদিনই ও কাঁদতে জানতো না। চমৎকার রোদ্দুরে ভরা দিন আজ,

নির্জন রাস্তায় কালো ছায়ার মতো ও ফিরে যাচ্ছে। বড়ো বড়ো করুণ চোখ—দুই চোখে আহতের দৃষ্টি। আঃ, আমার জীবনে ও যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। [একটু চুপচাপ সকলে। দ্বিতীয় সোফাটায় বসে গার্স্যাঁ আবার হাতে মুখ গুঁজলো।]

ইনিয়েজ : এস্তেল !

এস্তেল : ওকি মঃ গার্স্যাঁ !

গার্স্যাঁ : আবার কি হোলো !

এস্তেল : আমার সোফায় বসলেন যে আপনি !

গার্স্যাঁ : ক্ষমা চাচ্ছি। [উঠে দাঁড়ালো]

এস্তেল : আপনাকে কি রকম দেখাচ্ছিলো জানেন—যেন কতদূরে দূরান্তরে চলে গেছে আপনার মন। ছি-ছি—আপনাকে বিরক্ত করলুম।

গার্স্যাঁ : নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করছিলাম। [ইনিয়েজ হাসতে সুরু করলো] হাসছেন হাসুন। কিন্তু আমাকে অনুসরণ করলেই ভালো করতেন বোধ হয়।

ইনিয়েজ : কিছু দরকার নেই ! বেশ শৃঙ্খলা আছে আমার জীবনে। নিজের থেকেই গোছগাছ হয়ে গেছে। এ নিয়ে নতুন দুশ্চিন্তার কোনো কারণ দেখছি না।

গার্স্যাঁ : তাই নাকি ? খুব সহজ ভাবছেন তো ব্যাপারটা ! [কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিল] উঃ, কী গরম এ ঘরটা। কিছু যদি মনে না করেন তাহলে—[কোট খুলতে উদ্যত হল]

এস্তেল : ভয়ানক অভদ্র তো আপনি ! [আরো নম্র গলায়] না, কোটটা খুলবেন না দয়া করে। শার্ট পরা লোক আমি দেখতে পারি না।

গার্স্যাঁ : [আবার কোট গায়ে চড়িয়ে] বেশ, খুলবোনা। [একটু চুপচাপ] রাত্রিতে আমাকে সংবাদ পত্রের অপিসে কাজ করতে হোতো কিনা। সে একটা রীতিমতো অন্ধকূপ। কাজেই কক্ষনো আমরা কোট গায়ে রাখতে পারতুম না। এমন গরম লাগতো যে প্রাণ যায় যায়। [আবার চুপ। তারপরে সেই আগেকার স্বরে] ঐ তো আজো প্রাণান্তকর গরম পড়েছে। ওখানে এখন রাত্রি।

এস্তেল : হ্যাঁ। ওল্‌গা পোষাক ছাড়ছে। রাত দুপুর হবে। পৃথিবীতে কী চট্‌পট্‌ সময় কাটে।

ইনিয়েজ : হ্যাঁ, দুপুর রাত পেরিয়ে গেছে। ওরা আমার ঘরের দরজা সিল্ করে দিয়েছে। অন্ধকার,—পিচ্-কালো রাত আর নিবিড় শূন্যতা।

গার্স্যাঁ : চেয়ারের পিঠে কোট ঝুলিয়ে রেখে, শার্টের হাতা গুটিয়ে নিচ্ছে ওরা। হাওয়ায় মানব দেহ আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। [একটু থেমে] খালি শার্ট পরা লোকদের মধ্যে বাস করতেই ভালো লাগতো আমার।

এস্তেল : [বিরোধিতার স্বরে] তাহলে মেনে নেওয়া যাক যে আমাদের রুচি ভিন্ন। তাছাড়া আর কী বলা যায় একে? [ইনিয়েজ-এর দিকে ফিরে] আপনি কি বলেন? শুধু শার্ট পরা পুরুষ দেখতে কি ভালো লাগে আপনার?

ইনিয়েজ : আঃ পুরুষ। পুরুষ মানুষ আমার কোনো ভাবেই ভালো লাগে না।

এস্তেল : [অন্য দুজনের দিকে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে থেকে] আমাদের এই তিন-জনকেই যে কেন এক ঘরে রাখলো এরা আমার বুদ্ধিতে আসছে না? কী অর্থ হয়!

ইনিয়েজ : [হাসি বুকে চেপে] আবার শুনি, কি বললে?

এস্তেল : তোমাদের দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি—এখন থেকে আমাদের একই ঘরে বাস করতে হবে।···এর কোনো মাথামুণ্ড নেই। আশা ছিল পুরোনো বন্ধু, কী আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

ইনিয়েজ : পুরানো সেই প্রাণের বন্ধু, না?—মুখের মাঝখানে গোল একটা গর্ত যার! তাই না?

এস্তেল : নিশ্চয়ই, তাকেও দেখব আশা ছিল!···আহ্, তার মতো অমন স্বর্গীয় ট্যাঙ্গোনাচ আর দেখিনি। নাচই যেন তার পেশা ছিল।···সে যাক, কিন্তু আমাদের—এই আমাদের কজনকেই ওরা কেন একঘরে পুরলো? কেন? কেন?

গার্স্যাঁ : দৈবাৎ—বলতে হবে। যখন যেমন লোক আসে পর পর ওরা ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দেয় আর কি! [ইনিয়েজকে] কি? আপনি হাসছেন যে!

ইনিয়েজ : আপনার 'দৈবাৎ'-শুনে খুব মজা লাগছে! যেন দৈবের হাতে কোনো কিছু রাখে এখানে! তবে হ্যাঁ, সান্ত্বনা পাওয়ার মতো একটা কিছু ভেবে নেওয়া চাইতো?

এস্তেল : [সন্দেহের স্বরে] একটা কারণ অবশ্য হতে পারে। আচ্ছা, আমাদের জীবনকালে কোথাও কখনো কি আমাদের দেখা হয়েছিল! হতে পারে না?

ইনিয়েজ : কক্ষনো না! হলে আমি তোমাকে ভুলতে পারতুম না!

এস্তেল : অথবা, আমাদের পরস্পরের চেনা জানা বন্ধু কেউ হয়তো ছিলেন। দ্যুবায় সেমুরদের জানতেন আপনারা?

ইনিয়েজ : খুব সম্ভব না।

এস্তেল : কিন্তু সকলেই তো যেতো তাঁদের পার্টিতে!

ইনিয়েজ : কি করেন তাঁরা?

এস্তেল : কিছু তাঁদের করতে হয়না। সহরের বাইরে তাঁদের চমৎকার বাগান বাড়ী আছে; দলে দলে লোক নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যায়।

ইনিয়েজ : আমি কখনো যাইনি। ডাকঘরে আমি কেরাণীর কাজ করতুম।

এস্তেল : [ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে] অ, তাই।···তাহলে অবশ্য—[একটু থেমে] মঃ গার্স্যাঁ, আপনি?

গার্স্যাঁ : না, আমার সঙ্গেও জীবনে আপনার দেখা হয়নি। আমি আজন্মকাল রিওতে থেকেছি।

এস্তেল : তাহলে আপনার কথাই ঠিক। দৈবাৎ এখানে আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

ইনিয়েজ : দৈবাৎ বৈকি! ঘরখানা যে এই রকম আসবাব দিয়ে এভাবে সাজানো রয়েছে—এও তাহলে দৈবাৎ? ডানদিকের সোফাটা যে ক্যাটকেটে সবুজ, বা বাঁদিকেরটা মোদো-লাল রঙের—সেটাও দৈবাৎ! দৈব! সোফাগুলো এদিকে ওদিকে একটু সরিয়ে বসান না, দেখুন না চেষ্টা করে! ষ্টোভের উপর তাকে যে মূর্তিখানা দেখছেন—ওটাও কি দৈবাৎ রাখা আছে ভাবছেন? আর ঘরে এই রকম উত্তাপ? বলুন, তার মানেটা কী! [একটু থেমে] জেনে রাখুন, সব কিছুরই পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এখানে হিসেব করা, ওজন করা। দৈবের উপর কিছুই ফেলে রাখা হয়নি। আমাদের থাকার জন্যই বিশেষ করে এ ঘর গড়া হয়েছে।

এস্তেল : তাই বুঝি! তাহলে ঘরখানা এতো কুৎসিৎ করে সাজিয়েছে কেন!

সব দিকে কোণ্ বেরিয়ে আছে। এত অস্বস্তি লাগে! কোণাকুণি ভাবে ঘর সাজালে আমার ঘেন্না ধরে যায়।

ইনিয়েজ : [অধীরভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে] আর আমার বুঝি খুব সেকণ্ড এম্পায়ার রুচির বৈঠকখানায় থেকে অভ্যেস!

এস্তেল : সব কিছুই তাহলে ঠিক হয়ে আছে এখানে আগে থেকে?

ইনিয়েজ : নিশ্চয়। তাছাড়া আমাদের তিন জনকে তারা উদ্দেশ্য নিয়েই এক সঙ্গে রেখেছে।

এস্তেল : তুমি যে আমার ঠিক উল্টো দিকে বসে আছ এও কি দৈবাৎ নয়? এর মধ্যে আবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে!

ইনিয়েজ : আর কি কি প্রশ্ন আছে করে যাও। চেপে রেখে লাভ কি!

এস্তেল : আমি কি করবো, না করবো, আগে থেকে আর কেউ ভেবে রাখলে আমার সহ্য হয় না। ও রকম হলে যা নয় তাই করার জেদ চাপে।

ইনিয়েজ : বেশতো, চেষ্টা করো না! পারো তো দেখো চেষ্টা করে। কিন্তু এরা তোমাকে দিয়ে কি করাতে চায় তাও যে অজানা তোমার!

এস্তেল : [অধৈর্য হয়ে পা ঠুকে] অসহ্য! আমার উপরে তোমাদের দুজনেরই প্রভাব পড়ছে তাহলে? [একে একে দু'জনের মুখে চোখ বুলালো] প্রভাবটা নিশ্চয়ই নোংরা! মুখ দেখে অনেকের মনের কথা বোঝা যায়। কিন্তু তোমাদের মুখে কোনো ভাবের লেশ নেই।

গার্স্যা : [হঠাৎ ইনিয়েজের দিকে ফিরে] সত্যিই তো, এক ঘরে কেন রেখেছে আমাদের? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার কিছু ধারণা আছে, বলুন তো আপনার কি মনে হয়!

ইনিয়েজ : [সবিস্ময়ে] আমি কি করে জানবো? কোনো ধারণাই নেই আমার! আমিও আপনাদের মতোই অজ্ঞান।

গার্স্যা : কিন্তু জানতে হবেই। [কিছুক্ষণ চিন্তা করলো]

ইনিয়েজ : অবশ্য মন খুলে যদি সব কিছু বলার সাহস—

গার্স্যা : সব কিছু মানে?

ইনিয়েজ : এস্তেল!

এস্তেল : কি!

ইনিয়েজ : তুমি কি করেছিলে বলো। কেন তোমাকে আসতে হোলো এখানে?

এস্তেল : [কোনো দ্বিধা না করে] সে কথাইতো ভাবছি। একটু আবছা ধারণাও আমার নেই! সত্যি বলতে কি, মনে হচ্ছে এরা হয়তো সাংঘাতিক কোনো ভুল করেছে। [ইনিয়েজকে] হাসছো কেন! প্রত্যহ কী পরিমাণ লোক—আর কি, 'নিরুদ্দেশ' হচ্ছে ভেবে দেখো। হাজার—হাজার। কে তাদের বেছে বেছে ভাগ ভাগ করে? এখানকার সব চাকর বাকররা তো? অনেকেই হয়তো অপদার্থ। কাজেই মাঝে মাঝে ভুলচুক হওয়া খুব স্বাভাবিক। তবু হাসছো! [গার্স্যাকে] আপনি চুপ করে কেন? আমাকে হয়তো ভুল করেই এখানে পাঠিয়েছে। কে জানে, হয়তো আপনাকেও। [ইনিয়েজকে] তোমাকেও হয়তো! যাই হোক, ভুল করে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে একথা ভাবতেও তো ভালো লাগে।

ইনিয়েজ : তোমার কাহিনী তাহলে এইটুকু?

এস্তেল : আর কি বলব? লুকিয়ে রাখার কিছু নেই আমার। খুব ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি, ছোট্টো ভাই ছিল। আমার উপরেই তাকে মানুষ করার ভার। অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম আমরা। কাজেই আমাদের পরিবারের এক পুরণো বন্ধু যখন বিয়ের প্রস্তাব করলেন রাজী হয়ে গেলাম! ভদ্রলোকের অবস্থা ভালো, চমৎকার লোক। ভাইটি এমন রুগ্ন ছিল যে তখন তাকে যত্নে না রাখলে চলতো না। কাজেই উপায় ছিলনা এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে। বলুন, আর কি করতে পারতুম? স্বামী আমার বাপের বয়সী, তাহলেও ছ'বছর তো আমাদের বেশ সুখে কেটেছিলো। তারপরে এই দু'বছর আগে ওর সঙ্গে দেখা। ভালো না বেসে আমার উপায় ছিলনা। চোখে চোখ পড়তেই আমাদের নিয়তি আমরা বুঝে নিলাম। একদিন সে এসে বললো—চলো পালাই। তখন রাজী হতে পারলুম না। তারপরে তো নিউমোনিয়া হোলো আমার—শেষ হোলো আমার লীলাখেলা। এই আমার কাহিনী। জানি, একদিকে ভেবে দেখলে আমার অপরাধ হয়েছে। বয়সে তিন গুণ একটা লোকের পায়ে নিজের যৌবনকে বলি দেওয়ার অধিকার আমার ছিল না। [গার্স্যাকে] কি বলেন? একে কি পাপ বলা যায়?

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

আধুনিক সাহিত্য

মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্য কবিতার ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল, রবীন্দ্রানুসরণের পথ বেয়ে তা এসে সাম্প্রতিক অধ্যায়ে বিকাশলাভ করে। রবীন্দ্র-ভাবাদর্শের ব্যাপ্তিলোকে নজরুল-প্রতিভা এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করলেও ঐতিহ্যের রাজপথে সে অধ্যায়ও খণ্ডিত নয়। কিন্তু কথাসাহিত্যের দরবারে মুসলমান লেখকদের কোনো ঐতিহ্য নেই, এমনকি ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয় একথা অনস্বীকার্য। সাংস্কৃতিক পরিবেশে মুক্ত মনে যে সময়ে পুঁথিসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিলো, সেটা কাব্যেরই যুগ—সমাজ তখন সহজ জীবনযাত্রার দাক্ষিণ্যে অচঞ্চল। কথাসাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে শিল্পীর অবতরণ একসময় অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দিলো; পরবর্তীকালের পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশের দাবিতে। ইতিপূর্বেই ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে এক আকস্মিক ঝড় বয়ে গেছে। যন্ত্রযুগের ইঙ্গিত নিয়ে বণিকের মানদণ্ড তখন রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছে।

ভারত তথা বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী ভাঙনের সূত্রপাত হলো। শাহী তখ্‌ত্ হারিয়ে মুসলমানদের হলো অভিমান। প্রথমতঃ সক্রিয় রাষ্ট্রজীবন থেকে তারা দূরে সরে দাঁড়ালো; সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করলো ইংরেজ-পরিকল্পিত শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের সঙ্গে। এতে করে মুসলিম-সংস্কৃতি আপাততঃ নিঃশঙ্ক থাকলো বটে কিন্তু বাঙালী-মুসলমানের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিপন্ন হলো।

অন্যদিকে হিন্দুসমাজ পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিলো, ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রতিনিধিত্বও জয় করে নিলো। নানাপথে দৃঢ়তর হয়ে উঠলো তাদের অর্থনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ, নিজস্ব সংস্কৃতি তাদের আরো সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হতে থাকলো। যে পরাধীন আওতায় স্থির জীবনের আড়ালে হিন্দুসমাজে যখন রাষ্ট্রীয় মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক মুক্তিসন্ধানের শুরু—ধর্ম আর সংস্কৃতির জীর্ণ দেউলে রাষ্ট্রোদ্ধারের হাতিয়ার সন্ধান মুসলমান সমাজে তখনো শেষ হয়নি।

হিন্দুসমাজ যখন তার জলন্ত আভিজাত্যকে নিজের ভাষায় কথাকারে রূপ দিচ্ছে, মুসলমান সমাজ তখন প্রকৃতই মূক। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার যারা ধারক ও বাহক সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে মুসলমান সমাজে কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই তখন; জনজীবনের যা বক্তব্য তা শিক্ষার অভাবে আচ্ছন্ন। মুসলমান সমাজের আত্মঘাতী অভিমান তখনো অন্ধকারে পথের সন্ধান করছে। স্যার সৈয়দের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলেও প্রাথমিক ভ্রান্তিপ্রসূত দুর্ভোগের জের চলেছে প্রায় দেড়শো বছর। অগ্রগামী

দলের সঙ্গে দ্বিগুণ শক্তিতে পাল্লা দেওয়ার মত অর্থনৈতিক সামর্থ্য ছিলনা, নৈতিক বিশ্বাস বা সাহসও ছিলনা। দীনতাবোধ (inferiority complex) ইতিমধ্যে আক্রমণ করেছে। তার ওপর একদিকে ছিল সন্দিগ্ধ বৃটিশ প্রভু, অপরদিকে ছিল স্যার সৈয়দের বিরুদ্ধবাদী গোঁড়া মোল্লাসম্প্রদায়।

এর মধ্যবর্তীকাল হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুনিয়াদ যখন সম্পূর্ণ পোখ্‌ত তখন আর একটি ভ্রান্তির সূত্রপাত হলো হিন্দুসমাজে—যে ভ্রান্তি কিছু আগে ক্ষণস্থায়ী হয়ে দেখা দিয়েছিলো। দু'দিকে যার মূল উৎস ছিল একটি হৃতপ্রাধান্যের জ্বালাময় স্মৃতি, অপরটি আত্মকেন্দ্রিক আচ্ছন্ন দৃষ্টি।

শক্তিশালী রচনার সাহায্যে হিন্দু সাহিত্যিক ঘোষণা করলেন, এদেশ হিন্দুর, হিন্দু-সংস্কৃতি এদেশের নিরঙ্কুশ সংস্কৃতি, মুসলমানেরা এদেশে অবাঞ্ছিত পরগাছা। প্রাক-বৃটিশ যুগে যে হিন্দুসমাজ মুসলমানদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভারতে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল; সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্র ও স্থাপত্যে হিন্দু-মুসলিম মিলিত শিল্পসাধনার যে বিচিত্র রূপারোপ দেশের মর্মলোকে এক বলিষ্ঠ জীবনস্পন্দনের সঞ্চার করেছিল সেখানে এই দুর্ভোগের বীজ বহন করেছিল কারা এবং কী উপায়ে সে প্রসংগ আজ অবান্তর।

মুসলমান সমাজের চেতনায় এ আঘাত কিন্তু মূক রইলনা। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষায় তারা প্রতিবাদ জানালো। মুসলমান রচিত কথাসাহিত্যে ধারাবাহিকতা নেই। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত যে ক'টি বইয়ের নাম করা যেতে পারে তার প্রায় সব ক'টিই পৃথক আদর্শে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত। গল্পের ভাষাও বিশৃঙ্খল প্রয়াসের প্রমানবাহী। ভাষার ক্ষেত্রেও কোনো ধারাবাহিক বিকাশ সম্ভব হয়নি।

সামগ্রিক পটভূমিতে ঔপন্যাসিক ঘটনাবিস্তার কথাসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু তৎকালীন মুসলমান সমাজে তার পরিধি ছিল অনুপস্থিত। খণ্ড বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজে ঐক্যবদ্ধ জীবনধারার কোনো পরিচয়ই ছিলনা তখন। চৌদ্দশো বছরের ঐতিহ্যিক গরিমা তার শেষ সম্ভারের বিনিময়ে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল মাত্র।

কাজেই মুসলিম কথাসাহিত্যের প্রারম্ভকাল যদি ভাষা ও আঙ্গিকে এমন কি পরিবেশেও হিন্দু কথাসাহিত্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তা আস্বাভাবিক নয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সাংস্কৃতিক অচলায়তন এবং অশিক্ষার ফলে মুসলিম কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়নি, কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটিও মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। এমনকি উল্লেখযোগ্য কোনো ইঙ্গিতও বিরল হয়ে রইল।

কারো কারো বিশ্বাস মুসলমান সমাজে পর্দাপ্রথার কঠোরতা কথাসাহিত্যের সৃষ্টিতে প্রধান অন্তরায় হয়ে ছিল। এটি বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। নর-নারীর অবাধ বন্ধুত্বের পথে প্রীতি ও প্রেমের উজ্জ্বল রসসিঞ্চিত যে বলিষ্ঠ ও বিচিত্র জীবনপ্রবাহকে তাঁরা কথাসাহিত্যের প্রধান বা একমাত্র উপজীব্য বলে মনে করেন তার বিচ্যুতিইবা কথাসাহিত্যের সার্থক উপজীব্য হবে না কেন?

আসলে শিক্ষার বেস্তরে এবং সংস্কৃতির যে কেন্দ্রে সেই বিচ্যুতিকে দেখবার ক্ষমতা জন্মায় তেমন শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব না থাকায় দেখবার এবং দেখে বলবার লোকেরই অভাব ছিল। এই জন্যেই 'আনোয়ারা'র মত উপন্যাস সম্পূর্ণ মুসলিম পরিবেশে রচিত হয়েও শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস হতে পারলনা। দুর্বল নিকৃষ্ট ভাষায় সে কেবল পাপের ক্ষয় ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করেছে মাত্র। একই কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু' ভাষার ওজস্বীতা আর রচনাশৈলীর সুষ্ঠুতায় পাঠকের মনে চমক দিলেও মীর মশর্‌রফ্ হোসেনের অন্যান্য উপন্যাস সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যর্থ হয়েছে। বলিষ্ঠ গদ্যরচনার কীর্তিধর হয়েও ডাঃ লুৎফর রহমানের দু-একটি উপন্যাস চরম ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে। যথেষ্ট বাস্তব ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সর্বপ্রথম যাঁর দেখা পাওয়া যায় তিনি মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ।

কাজি ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' সত্যিকার মুসলিম।জীবনের বহু স্তরে আলোকপাতে সক্ষম হয়েছে একথা যেমন মেনে নিতে হয়, তেমনি সেই সঙ্গে বলতে বাধ্য, ঔপন্যাসিক রসাভিসার থেকে 'আবদুল্লাহ'র কাহিনী বঞ্চিত। আঙ্গিক ও রসের ক্ষেত্রেও হেদায়েতুল্লাহর গল্পগুলিই অপেক্ষাকৃত সার্থক।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা ঐক্য দেখা দেয়। এই উপলব্ধি ক্রমে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যে দীর্ঘকাল অশ্রদ্ধবিসর্জনের চোরাগলি দিয়ে যে কুশিক্ষা আর কুসংস্কার সমাজকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছে তা থেকে তাকে বাঁচাতে হলে প্রতিবাদের অস্ত্র চাই, বাস্তব চিত্রাঙ্কনের সাহস চাই। পুরোভাগে যাঁরা এসে দাঁড়ালেন তাঁরা হচ্ছেন আবুল মনসুর আহমদ, মাহবুল আলম, আবুল ফজল এবং আরো কয়েকজন। এই সময়কার তরুণ অভিযাত্রী মোহাম্মদ কাসেম তাঁর 'আগামীবারে সমাপ্য'তে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেননি। উল্লেখিত বাকি তিন জনই আজ সাধনার সম্ভাব্য সফলতার শেষ স্তরে উপনীত। আবুল মনসুরের বেদনাবোধ যেখানে কঠিন ব্যঙ্গের কশাঘাত হয়ে দেখা দিয়েছে আবুল ফজলের বেদনাবোধ সেখানে আকুতিপ্রকাশে শেষ হয়েছে। সমাজের মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র বিশ্লেষণে মাহবুবুল আলম মুসলমান সমাজে আজো সম্পূর্ণ একক। ছোট ছোট খণ্ড চরিত্রের সার্থক রূপায়নে আকবরউদ্দীনও এই পর্য্যায়ের স্মরণীয় একজন।

সার্থক ছোটগল্প কিছু কিছু পাওয়া গেলো, কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্র রইল অনধিকৃত। নজরুল্ ইস্‌লাম সমসাময়িক হলেও তাঁকে পৃথক ভাবে বিচারের প্রয়োজন আছে। কারণ তাঁর গল্পের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ রয়েছে। আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাধান্যে তাঁর উপন্যাস 'কুহেলিকা' ধর্মচ্যুত হলেও 'মৃত্যুক্ষুধা' তাঁর বলিষ্ঠতর সৃষ্টি। সবচাইতে বড় কথা 'আবদুল্লাহ'র পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত রুচিবান পাঠকের পাঠযোগ্য মুসলিমরচিত কথাগ্রন্থ তিনটি 'মৃত্যুক্ষুধা' বিস্তৃতর মুসলিম পরিবেশে রচিত ও 'সওগাতে' প্রকাশিত আবুল মনসুরের 'জীবনক্ষুধা' এবং উপন্যাসিক ধর্মচ্যুত চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী মাহবুবুল আলমের 'মো'মেনের জবানবন্দী'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মুসলমানরা ছোট গল্পে আরো বেশী শক্তির পরিচয় দেয়। কেউ কেউ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের দরবারে স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিত্যে ইতিমধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠেছে, বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে; নর-নারীর প্রেম এবং প্রেমের পথে সমস্যা বা দ্বন্দ্বকে প্রধান উপজীব্য না ধরেও সার্থক কথাসাহিত্য হতে পারে এমন নিদর্শন দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের রাজপথে, সামাজিক ভাঙাগড়ার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে নৈর্ব্যাক্তিক মানসের স্পর্শই এই নতুন পদক্ষেপকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তুললো।

আধুনিক মুসলিম কাহিনীকারদের দৃষ্টি এই পরিবর্তনের পথে অন্ধতার ভান করেনি। তাই স্বাভাবিক ধারার ক্রমবিকাশের মধ্যবর্তী পথকে তারা যেন এক লাফেই অতিক্রম করে এলো, নাই বা রইল সে পথে কোনো পদচিহ্ন, তার শেষ পদপাত নির্ভুল। তাই 'পদ্মফুলে'র শওকত ওসমান 'ফাঁদার জোয়ানেস্' আর 'ডিক্টেটর' নিয়ে কারবার শুরু করলেন, 'বনিআদম' উপন্যাসে মানুষের কথাই বলবার প্রয়াস পেলেন, আবুল কালাম সামসুদ্দীন বহন করলেন 'কেরায়া নায়ের মাঝির' পরিচয়।

আর একই অভিজ্ঞার পথে নবপ্রকাশিত উপন্যাস 'লাল সালু' তার অগ্রজদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হয়েও বরং বলা যেতে পারে ব্যতিক্রম হয়েই একালের মুসলিম রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে দাবি জানালো। নতুন সংজ্ঞায় বিচার করবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার; সংজ্ঞা সর্বজন স্বীকৃত হয়নি। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো বাস্তববোধসম্পন্ন সাহিত্যিকের মনে আজ আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আবর্তিত কালের প্রধান লক্ষণটি নিজের দাবিতে স্বাভাবিক পথেই শিল্পীর সৃষ্টিতে এসে জায়গা করে নেবে; যেমন আজ নিয়েছে জনজীবনের ক্ষুব্ধতা, তার বঞ্চনা, তার প্রতিবাদের তীব্রতা। কিন্তু বিষয়বস্তু কোন্ আঙ্গিকে কি রূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে সে সম্পর্কে কোনো উদ্দেশ্যমূলক নির্দেশ সাহিত্যে বাঞ্ছনীয় বলে শিল্পীরা সকলেই মেনে নেননি। আরো মেনে নেননি, সত্যি হোক মিথ্যে হোক কোনো একটি চরিত্রের যে বিশেষ বক্তব্যে অধিকার নেই, তাকে দিয়ে তাই বলানোর ডিক্টেটরী মনোভাবকে। ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি যদি পরাজয় হয়, আসুক না সেই পরাজয়—ক্ষমতাবান শিল্পী সেই পরাজয়ের প্রতি জাগিয়ে তুলবেন অশেষ ঘৃণা। মনে রাখা দরকার, যে মানুষ ঘুমন্ত তাকে জাগ্রত বলে ঘোষণা করলে তাকে আরো ঘুমোবার সুযোগ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন আসে 'লাল সালু'র অন্তর্গত মানুষগুলি কি জাগ্রত? প্রতিবাদে যে তীব্রতর কথা বলা হয়েছে 'লাল সালু'র পরিবেশে তার ঢেউ পৌঁছেছে কি? আজো যেখানে সহস্র বঞ্চনাকে আল্লার রহমত বলে উপদেশ বর্ষিত হচ্ছে, এবং নতুন এক পরিবেশে সে উপদেশ পুনরায় জোরালো হয়ে উঠবার সুযোগ পাচ্ছে সেখানে প্রতিবাদের তীব্রতা কেন, প্রতিবাদই আশা করা অশোভন।

এই জন্যেই স্রষ্টা লেখক 'লাল সালু'র আবরণে যে পাপ ঢাকা আছে তার সেই

আবরণ উন্মোচন করেছেন, প্রবঞ্চকের মুখোস খুলে ধরেছেন—আশা রেখেছেন : অশেষ ঘৃণা প্রতিবাদে অতঃপর সে বঞ্চনা দগ্ধিভূত হবে।

জনতা নিজের লড়াই নিজেই করে কিন্তু পুরোভাগে যারা পরিচালক তাদের যদি ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয় তার ফল হবে মারাত্মক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'লাল সালু'তে সে ভুল করেন নি বলে কোনো কোনো মহলে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবেন।

অতঃপর বিচার্য্য 'লাল সালু'র মাধ্যমে সেই অবাঞ্ছিত পরিবেশের প্রতি লেখক কতখানি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই বিচারই তার সৃষ্টির মান নির্ণয় করবে।

নায়ক মজিদ স্পষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মানসিক দ্বন্দ্বের বর্ণনায় মাঝে মাঝে লেখকের নিজের তীক্ষ্ণ মননশীল মনটি প্রধান হয়ে উঠতে চেয়েছে। সৌভাগ্যের কথা সে বিভ্রান্তির পরিসর খুব অল্প।

ধর্ম্ম ভাঙিয়ে স্বার্থোদ্ধারের নজির এদেশের সামাজিক ইতিহাসে সবচাইতে ঘৃণিত অধ্যায়। স্বার্থোদ্ধারের সাধনা-নিমগ্ন অন্তর নিজেরও অজ্ঞাতে কি ক'রে ক্রমশঃ তার পরিসর ও প্রচারিত ধোঁকার প্রতি বিশ্বাসে স্থির হয়ে ওঠে তার জলন্ত প্রমাণ মজিদ। মজিদের ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক শান্তি ও বিনারের ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা ও বঞ্চনা তাকে অহর্নিশ ঘিরে রেখেছে তা চোখ খুলে দেখবার অবসর সে পায়নি কিন্তু পাঠকের সমস্ত অন্তর্লোকে সে ছায়া বিভীষিকার সৃষ্টি করবে। এই শিল্পকৌশলই লেখককে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে একদিন উত্তীর্ণ করবে সন্দেহ নেই।

একটি মানুষকে কেবলমাত্র দেবতা বা কেবলমাত্র শয়তানরূপে বিশ্বাস করা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাজ নয়। তার শ্রেষ্ঠত্বই হচ্ছে মানুষকে ভালবাসায়, দেবতার পূজায় বা শয়তানের প্রতি ঘৃণায় নয়। সৃষ্টিকে তার বৈচিত্র্যে তার সামগ্রিকতায় দেখাতেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিচয়। মজিদ এমন একটি চরিত্র যার লোভও আছে ক্ষোভও আছে। স্বার্থোদ্ধারের পথে তার পরিকল্পনা যেমন সবল, তেমনি মানুষের প্রতি ভালবাসায় তার বিহ্বলতাও লক্ষ্যযোগ্য। মজিদ চেয়েছিল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন, যে জীবনে প্রেম আছে, প্রীতিস্নেহের মাধুর্য্য আছে, আর আছে সম্পদের প্রাচুর্য্য। কোন পথে সে তার কাম্যকে অর্জ্জনের প্রয়াস পেয়েছিলো তার সন্ধান মজিদের অন্তর্লোকে না করে জীর্ণ ঘুণেধরা সমাজের কেন্দ্র স্থলেই তার সন্ধান সমীচীন। জীবন অর্জ্জনে মজিদের গৃহীত উপায়কে ঘৃণা করেও তার জন্যে বেদনাবোধের সৃষ্টি হয়, তার জীবনের অন্তর্লীন ট্রাজেডী মনকে স্পর্শ করে, এখানেই চরিত্র স্রষ্টার সার্থকতা।

জামিলার উপস্থিতি স্বল্পকালের কিন্তু জমিলাই 'লাল সালু'র প্রাণবন্ত। জমিলা না এলে 'লাল সালু' উত্তীর্ণ হওয়ার পথ পেত কিনা সন্দেহ। আত্মপ্রতারক মজিদের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে জমিলাই অগ্নি স্পর্শের সঞ্চার করে গেছে মুহূর্ত্তে। তার সমগ্র জীবনের সাধনাকে সে স্পষ্ট প্রতিবাদে দীর্ণ করে দিতে চেয়েছে।

যে সমাজ ও যে এলাকা 'লাল সালু'তে পরিধৃত সে সমাজ ও সে এলাকা সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্'র অভিজ্ঞতা প্রচুর; কিন্তু দৃষ্টির স্বল্পপ্রসার সে অভিজ্ঞতাকে পুরোপরি কাজে লাগাতে দেয়নি। সে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন রূপ 'লাল সালু'তে উপস্থিত নয়। তবুও সত্যিকার মুসলিম সমাজের সামগ্রিক জীবন ধারার বিস্তৃততর পটভূমিতে মুসলমান রচিত উপন্যাসের ঐতিহ্যিক গোড়াপত্তন আমার মনে হয় এখানেই।*

আহ্সান হাবীব

বর্ষণ

শুষ্ক-জল নদী, তৃষাদীর্ণ মাঠ, রৌদ্র-দগ্ধ গৈরিক দিগন্ত। কতো দিনের কতো দাহ, কতো শুষ্কতা। মাঠ তৃষার্ত, বন তৃষার্ত, মাটি তৃষার্ত, পশু পাখি মানুষ সবাই তৃষার্ত। ধরণী তপরতা উমার মতো শীর্ণা। পৃথিবী রৌদ্রদাহে পাণ্ডুর। সব আবিলতা, সব জঞ্জাল পুড়ে শেষ হোয়ে গেলো। এখন নামলো ধারা। দহন ছাড়া কি রস আসে? রৌদ্রদাহের পর এলো ধারা। রোদে-পোড়া মাটির বুক ভেদ করে এলো জল। যে জল লুকিয়ে ছিলো মাটির বুকে, সে জল রৌদ্রতাপে মাটির বন্ধনমুক্ত হোয়ে গেলো আকাশে, আবার ফিরে এলো বৃষ্টিধারায় মাটির বুকে। কাছের যে তাকে এমনি করে দূরে যেতে হয় আবার সত্যি করে কাছে ফিরে আসবার জন্যে। সেই শুষ্কতার, তৃষাদীর্ণ আকুলতার অবসান আনে বর্ষণ, আনে নূতনের আভাস, পূর্ণতার ইঙ্গিত। তাই বর্ষার উৎসব। সব উৎসবই পূর্ণতার ইঙ্গিত দেয়, পরিবর্তনের আগমনী গান গায়। প্রাচীন কাল থেকে বর্ষার উৎসব চলে আসছে আমাদের দেশে। বর্ষাকে বন্দনা করেছেন আমাদের দেশের কবিরা যুগে যুগে। মহাকবি কালিদাস তাঁর ঋতুসংহারে বর্ষার অপরূপ রূপ বর্ণনা করেছেন :

"প্রিয়ে দেখো বর্ষা ঋতু আসছে, রাজার মতো তা'র দ্যুতি, জলভরা মেঘ হোলো এই রাজার মত্ত হস্তী, বিদ্যুৎ তা'র পতাকা, বজ্রের নির্ঘোষ হোলো মাদলের জয়ধ্বনি। আকাশে মেঘ টলমলো, কোনো মেঘ নীলোৎপলের মতো নীল, কাজলের মতো কালো কোনো মেঘ। চাতক তৃষিত। মেঘের দল মাদল বাজাচ্ছে, তা'র ধ্বনি শোনো বজ্রের আওয়াজে। ময়ূরীদল কলাপ বিস্তার কোরে কেকাধ্বনি করছে। বর্ষার জলে তটিনীগুলি আবিলা, অভিসারিকার মতো অন্ধ আবেগে ছুটে চলেছে তারা সিন্ধুপানে। হরিণরা ভয়ে সচকিত। অভিসারিকারা বিদ্যুতের আলোতে পথ চলছে। নব-বরষার জল সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে। দাদুরী সর্প-গতি জলধারা দেখে ভীত ও চকিত। শাল, কদম্ব, অর্জুন, কেতকী বর্ষার ধারায় কম্পিত ও সজল। আজ মেঘদল বিরহিণীদের মন চুরি করছে। বধূরা বনফুল যুঁথীমালতীর মালা পড়েছে কালো কেশে, কর্ণে তাদের নবকদম্বের আভরণ।

* লাল সালু—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। কমরেড পাবলিশার্স। ৬২নং সুভাষ এভেনিউ। ঢাকা ২।৮০

বনানীর তপজ্বালা আজ বৃষ্টি-ধারায় প্রশমিত। বনানীর দেহে রোমাঞ্চ সম ফুটেছে আজ কদম ফুল।' চমৎকার বর্ণনা প্রকৃতির, কিন্তু এ বর্ণনা একান্ত ভাবে বারমহলের বর্ণনা। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও নারী-দেহ কবিকে এমন দিশেহারা করে দিয়েছে যে কবির সৌন্দর্য-বোধ রসের সংযম হারিয়ে একেবারে উশৃঙ্খল। স্থূলতার ফেনায় কবি আচ্ছন্ন করেছেন তাঁর মানস-সুন্দরীকে। সৌন্দর্যের গভীর, প্রশান্ত, বেদনা-মাখানো অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেননি কালিদাস 'ঋতুসংহারে'। বারমহলের কাব্য 'ঋতুসংহার'। 'মেঘদূতে' সুর বদল হয়েছে, রসের সংযম এসেছে, তবুও 'মেঘদূতের' বর্ষা বাইরের বর্ষা থেকে গেছে, অন্তরে বর্ষা নামাতে পারেন নি মহাকবি।

বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় বর্ষা মানবীয় রসে নিটোল হোয়ে উঠলো। স্থূলতা, রসের আবিলতা বৈষ্ণব কবিতায় যথেষ্ট আছে, কিন্তু রসের শুচিতা, অন্তর্মুখীনতার নিদর্শনও কিছু কবিতায় আছে। বর্ষার বর্ণনা করে বিদ্যাপতি বলছেন—বারিস জামিনি, কোমল কামিনী, নিদারুণ অতি অন্ধকার। পথ নিশাচর সহসে সঞ্চর, ঘনপর জলধার।

বর্ষারাত্রি, কামিনী কোমলা, ঘন অন্ধকার। পথে নিশাচর, অবিরল ঘন জলধারা, কেমন করে যায় সে অভিসারে?

একটি কবিতায় বলছেন বিদ্যাপতি—গগনে গভীর গর্জন, মন তার ভ্রূক্ষেপই করে না। বজ্রপাতে ভীত হোয়ে মন মুখ ঘোরায় না। শুধু ভয় যে বৃষ্টির ধারা রাত্রির অন্ধকার ও নয়নের কাজলের মতো অন্ধকারকে ধুয়ে না দেয়। অভিসারে যেতে হবে তো!

বলছেন বিদ্যাপতি—রাত্রি আজ কাজল পরলো। ঘন মেঘ বারি-বর্ষণ-রত। আজ অভিসারে যাওয়ার বড়ো কষ্ট। যমুনায় আজ ভয়ঙ্কর ঢেউ। অনুরাগের বেগে যদি জলে নামো, তীর পাবে না। ঢেউ আজ বিদ্যুৎকে ভয় দেখাচ্ছে। 'বিজুরী তরঙ্গ ডরাই'।

বলছেন কবি—ময়ূরের কেকা আমার বিরহ-বেদনা বাড়াচ্ছে। এলো প্রথম আষাঢ়, গগনে গভীর গর্জন। বৃষ্টি ঝরছে তীক্ষ্ণ ধারায়, মনে হচ্ছে যেন মদনের তীর এসে বিঁধছে। বিরহিণী বাঁচে কি করে?

বাদল আর অভিসার থেকে কবিতা ক্রমশই মনের গহনে এগিয়ে গেলো। বিরহ শুধু দেহান্তক রইলো না।

বললেন কবি—ধরণীর বুক আজ দীর্ণ। মেঘ ঘন গর্জনে বর্ষণ করছে। প্রিয় আজ বিদেশে, তার আসবার সময় গত। বর্ষার রাত, হায়রে, আমার মন্দির আজ শূন্য। কি করবো আমি একা! ক্ষীণ তটিনী আজ বিপুলা, জল আজ গভীর, কেমন করে আসবে আমার পথিক?

বলছেন—আকাশে নিবিড় মেঘ, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন, বজ্রপাতের শব্দ হচ্ছে, বাতাস দিচ্ছে সজোরে ঝাপ্‌টা। এতো বিঘ্ন চারদিকে, তবুও এ বিঘ্নকে আমি কি ডরাই? আমার মন প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশায় অভিসারে বের হয়েছে। বিচারের কি আছে, তার ভয়েরই বা কি আছে?

বলছেন—সখি হে হমর দুখক নহি ওর।

সখি, আমার দুঃখের অন্ত নেই। আজ ভরা বাদর, আমার মন্দির শূন্য। মেঘ গর্জন করে সারা ভুবন ব্যেপে বর্ষণরত। প্রিয়তম প্রবাসে, আমি গভীর বিরহ-কাতর। বিদীর্ণ হচ্ছে আমার বুক। দশদিক ভরে আজ ঘন অন্ধকার। অস্থির বিজুলী ছোটাছুটি করছে। এমন দিন রাত কাটাবো কেমন করে?

বাইরের জগতের বর্ষা বুকের পাঁজরে আঘাত হান্‌তে হান্‌তে অন্তরে পৌছে গেলো।

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়
বিরহিণী বেদন বাঢ়। (বিদ্যাপতি)

আষাঢ় অন্তরে এলো, বিরহিণীর বেদন বেড়ে গেলো।

বর্ষাকে অন্তরের গহনে বইয়ে দিলেন কবি। বর্ষা শুধু বাইরের প্রকৃতির বর্ষা হোয়ে থেকে গেলো না। মানুষের অন্তরলোকেও নামলো এসে বরিষণ। কবি ধন্য হোলেন।

ভারতচন্দ্রও বর্ষার বর্ণনা করেছেন চৌপদীতে—

বর্ষা-বর্ণনা

ভুবনে করিল তূর্ণ নদ-নদী পরিপূর্ণ
বিরহিণী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্ষা।
বিদ্যুতের চকমকি ডাহুকের মকমকি
কামানল ধক্‌ধকি বড় হৈল কর্ষা।
ময়ূর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
আর কি বিরহী বাঁচে বুঝিনু নিকর্ষা।
ভারতের দুঃখ-মূল কেবল হৃদয়ে শূল
ফুটালি কদম্ব ফুল আ আরে বর্ষা॥

এই কবিতায় ছন্দের কারিকুরি আছে, বিরহের উল্লেখও আছে, কিন্তু এ বিরহ কামানল ধক্‌ধকির নামান্তর, একান্ত ভাবে দেহ-সম্বল বিরহ। এই চৌপদীর ছন্দের বাহাদুরীর তারিফ করা যেতে পারে, কিন্তু এই ভাববিহীন ছন্দোবদ্ধতা হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

চীন দেশে বারোশো খৃষ্টাব্দে লু ইউ নামে এক বিখ্যাত কবি ছিলেন। বৃষ্টির উপর তাঁর দুটি চমৎকার কবিতা আছে। একটি হচ্ছে 'বৃষ্টির হাওয়া'।

বৃষ্টির হাওয়া

পাহাড়ের চূড়োকে অবগুণ্ঠনে ঢেকে দিচ্ছে বৃষ্টির হাওয়া। নদীর গর্জনে কুটিরগুলি কাঁপছে। মেঘে মেঘে আকাশ কালির মতো কালো। ঢেউগুলোকে ফুলের মতো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বৃষ্টির হাওয়া।

অন্য কবিতাটি হচ্ছে—

বসন্তের বৃষ্টি

বসন্তের বিষাদ থেকে মুক্তি নেই। কখন থামবে বসন্তের বৃষ্টি ?

মাসগুলো কালো, ধূসর ও বেদনভরা। টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি পড়ছে ভোর পর্যন্ত। অন্ধকার বাতায়ন। বীণার তারগুলো বাজছে ধীরে ধীরে। আমার নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে ঢালছি নতুন সুরা।

অন্তর্লীনতা আছে এই দুটি কবিতায়। দরদী কবি বৃষ্টিকে বুকের মধ্যে পাঁজরের তলায় টেনে নিয়েছেন।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বর্ষার আদর নেই, বরফের আদর আছে। শরতের বৃষ্টি, শীতের শেষে বসন্তের প্রথম বৃষ্টি ইয়োরোপীয়দের কাছে সমাদর পায় নি। বৃষ্টির উপর কবিতা ইয়োরোপীয় সাহিত্যে নেই বল্লেই চলে। তবুও দু'তিনটি কবিতা যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা'র থেকে ইয়োরোপের কবিরা বৃষ্টিকে কি ভাবে দেখেছেন তা'র পরিচয় পাওয়া যাবে।

বৃষ্টির উপর শেলীর একটি ছোট্ট চার লাইনের কবিতা আছে আর আছে বৃষ্টির উপর তাঁর একটি লাইন।

লাইনটি হচ্ছে—বাতাসে ছিলো বৃষ্টির মাধুরিমা।

চার লাইনের কবিতাটির নাম 'বৃষ্টি'।

আপনার জল-ভারে বেদনায় মন্থর কন্‌কনে বাতাস যখন এই ধূসর আলোহীন আবহাওয়ার মধ্যে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় তখন নামে বৃষ্টির থামখেয়ালী ধারা ;

আমেরিকার কবি হুইট্‌ম্যানের একটি কবিতা আছে বৃষ্টির উপর। কবিতাটির নাম 'বৃষ্টির ভাষা'।

বৃষ্টির ভাষা

'শুধালুম আমি ঝির্‌ঝির করে ঝরে পড়া বৃষ্টির পশ্‌লাকে—কে তুমি, তুমি কে ? কি উত্তর দিলো বৃষ্টি, শোনো।

বল্‌লো বৃষ্টি—এই ধরণীর কবিতা আমি। অতল সমুদ্র আর ভূমি হোতে আমার জন্ম। অলখরূপে আমি নিরন্তর ধেয়ে চলি আকাশের দিকে।

আকাশে আমি আবছায়া রূপ নিই, একেবারে বদল করি নিজেকে, তবুও আমি আগে যা ছিলুম তাই থাকি। আমি আসি অনাবৃষ্টি, রেণুপরমাণু, পৃথিবীর ধূলি-স্তর-গুলকে ধুয়ে দিতে। আর এদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে বীজরূপে আমার বিহনে, অজাত, সুপ্ত সেই সবকে সিক্ত করতে আমি নেমে আসি।

আমার উৎপত্তিকে, যাদের থেকে আমি জন্মলাভ করেছি সেই সমুদ্র আর ভূমিকে চিরকাল দিনে রাতে ফিরিয়ে দিই আমি প্রাণ, করি নির্মল, করি সুন্দর।'

ইটালীর কবি ডান্নুন্‌ত্‌সিও একটি অপূর্ব কবিতা লিখেছেন বৃষ্টির উপর। কবিতাটি হচ্ছে 'বৃষ্টি পাইনের বনে'।

বৃষ্টি পাইনের বনে

'আজ বনানীর প্রান্তদেশে, শুনিতে না পাই কোনো কানাকানি মানবের স্বরে। শুনি শুধু দূরে কোন্ কথা বৃষ্টি ফোঁটা পল্লবেতে বলাবলি করে। শোনো, বৃষ্টি ঝরে খণ্ড মেঘ হতে। কণ্টকিত পাইনের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝরঝর ধারে। মঞ্জরিত জিনেষ্ট্রোর পরে বৃষ্টি এসে নামে। বৃষ্টি ঝরে ঝরঝর মুখে আমাদের, বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত আমাদের হাতে। বৃষ্টিপড়ে ফুর্‌ফুরে বসনের পরে। বৃষ্টি ঝরে ঘুণে-ধরা মনের চিন্তায়। বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে, যে কণ্ঠের সুরে কাল তুমি ভুলেছিলে, আজ আমি ভুলেছি ছলনে, অয়ি এরমিওনে। শুনিতে কি পাও ? বৃষ্টি ঝরে সঙ্গীহীন তৃণপরে। শোনো বৃষ্টির কান্নার উত্তর দিতেছে সঙ্গীত ঝিল্লীর। পাইনের তরু এক সুরে গান গায়, অন্য সুরে গাইছে মির্‌টো। জিনেপ্রোও গেয়ে চলে আপনার সুরে। নানা যন্ত্র যেন বেজে ওঠে শত শত অঙ্গুলি পরশে। মোরা দোঁহে ডুবে গেছি বনানীর প্রাণপূর্ণ অন্তরের তলে। তব মুখ বৃষ্টি পিয়ে হোয়েছে মাতাল, সিক্ত সুকোমল পল্লবের মতো। তব কেশ ঝলসিছে আলোকিত জিনেষ্ট্রোর মতো। শোনো, শোনো, বাতাস-ঝিল্লীর গান মূক হোয়ে আসে বর্ষণের বেড়ে-চলা ক্রন্দনের তলে। শুধু এক সুরে কেঁপে ওঠে, নিবে যায়, জ্বলে ওঠে, কেঁপে মরে, শেষে যায় নিবে। সিন্ধু-ধ্বনি শোনা নাহি যায়। শুধু শুনি পল্লবের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝরে। বৃষ্টি সে রূপালি, বৃষ্টি সে নির্মল। শোনো, সুদূরের জলার নন্দিনী দাদুরী সে গায় ঘন ছায়াতল হোতে। সে কোথায় ? সে কোথায় ? নয়ন-পল্লবে তব নামে বরিষণে, অয়ি এরমিওনে। বৃষ্টি পড়ে তব কালো আঁখিপত্রপরে, যেন তুমি কাঁদিতেছো সুখভরে, শুভ্র অশ্রু নয়। যেন প্রায় কালো অশ্রুরূপে বাহিরিয়া আসিয়াছ তব দেহ হতে। বৃষ্টি পড়ে ঝরঝরে মুখে আমাদের। বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত আমাদের হাতে। বৃষ্টি পড়ে ফুর্‌ফুরে বসনের পরে। বৃষ্টি পড়ে ঘুণে-ধরা মনের চিন্তাতে। বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে, যে কণ্ঠের সুরে কাল তুমি ভুলেছিলে, আজ আমি ভুলেছি ছলনে, অয়ি এরমিওনে।'

শুধু পাইনের বনে এ বৃষ্টি নামে নি, এ বৃষ্টি নেমেছে ঘুণে-ধরা মনের চিন্তাতে, কণ্ঠের ধ্বনিতে। এ বৃষ্টি শুধু পাইন, জিনেষ্ট্রো আর মিরটোকে সিক্ত করেনি, এ বৃষ্টি আমাদের মুখ সিক্ত করেছে, মনের চিন্তাকে সিক্ত করেছে, এরমিওনের কেশকে সিক্ত করেছে, এরমিওনের মুখ মাতাল হয়েছে এই বৃষ্টি পিয়ে।

এলেন এক কবি এই বাঙালাদেশে, জানি না কি মন্ত্রে তিনি প্রকৃতির মন ভোলালেন। সরিয়ে নিলো প্রকৃতি তার মুখের অবগুণ্ঠন, বুকের আঁচল। জেনে নিলেন কবি তার প্রাণের সব রঙ, সব মাধুর্য। এমন করে আঁচল সরিয়ে, অবগুণ্ঠন খুলে প্রকৃতি আর কাউকে কখনো জানিয়ে দেয় নি আপনার রূপ-রস-গন্ধ।

প্রকৃতির সব রহস্য জেনে নেবার আনন্দে ভরপুর হোয়ে কতো ছবি, কতো বিচিত্র ছবি, বিশেষ কোরে বর্ষার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান। আকাশ ঘিরে মেঘ, ঝাপ্‌সা গাছ-পালা। আকাশে সন্ধ্যের ছায়া, মন্দিরেতে কাঁশর ঘন্টা বাজলো ঠং ঠং। এই ঠং ঠংও মনের ছবির অঙ্গ। সেই বৃষ্টি নিয়ে গেলো স্মৃতির মঞ্জুষা খুলে বাল্যের দিনগুলিতে। তারপরে বৃষ্টির ধারা বেয়ে পৌঁছলুম গিয়ে সুয়োরাণীর দুয়োরাণীর দেশে, কঙ্কাবতীর ঘাটে, শিবঠাকুরের দরজায়। একেবারে রূপকথার রাজ্য। বাস্তবের পার থেকে ওপারে রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে দেবার খেয়া হোলো বৃষ্টি।

ছবি গেলো বদলে। নীল অরণ্য শিহরিছে বজ্রের গর্জনে। ভিজে মাটির গন্ধে উন্মনা নব-যৌবনা বরষা আসছে। আজ মেঘের কাজল-পরা দিন, প্রহরগুলি আবেশে মন্থর কোথায় আছো তোমরা? আজ নীপশাখে ঝুলনা বাঁধো। অধরে অধরে অলকে অলকে মিলনের দিন আজ।

আমাদের ডাক দিয়ে কবি বল্লেন—দেখ, বাদলের ধারা ঝরঝর ঝরছে, আউষের ক্ষেত জলে ভরভর, ওপার কালি-মাখা মেঘে আঁধার। ঘাটের পথ পিছল, বেণুবন ঘনঘন দুল্‌ছে।

শুধু এই ছবিগুলি এঁকেই কবি কিন্তু থেমে যান নি। যতোই সুন্দর হোক্ না কেন এই ছবি, এ ছবি দেখার পরেও মন বলে—বাকী থেকে গেলো, মেঘ মনের আকাশে এলো না। পুব হাওয়া বুকের মধ্যে বইলো না, বর্ষা নাম্‌লো না হৃদয়ের শুষ্ক মরুভূমিতে।

বৃষ্টি তাই শুধু মেঘের বৃষ্টি রইলো না, বৃষ্টি হোলো আকাশের মনের কথা। 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে।' নেমে এলো সেই মনের কথা আমার বুকের মধ্যে। আজ বর্ষা উছল। কালো ঘন কেশের মতো ঘন কালো মেঘ নেমেছে তীরে। কিন্তু এই তীরতো আমার হৃদয়-নদীর তীর। 'আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তলসম, মেঘ নামিয়াছে মোর দুইটি তীরে।'

ঘন ঘোর বরিষা, তপনহীন তমসা, সব ব্যর্থ হবে যদি তাকে কিছু না বলা যায় এমন দিনে।

'এমনদিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়,
এমন মেঘ-স্বরে বাদল ঝরঝরে তপহীন ঘন তমসায়।'

এই ঘন ঘোর মেঘ, রৌদ্রহারা দিন, ঝরঝর বাদল সব ভিতরে বাইরে ছুটোছুটি করছে। আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে। শুধু কি মাঠবন সিক্ত হোলো সেই বৃষ্টিতে? শুধু কি নদীই ভরে উঠলো কূলে কূলে? না, তা নয়।

মন সিক্ত হোয়েছে, 'হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে না পাই কূল।'

আজ বৃষ্টি-ধারা নেমেছে, তা'তে কি শুধু ময়ূরময়ূরীই নাচছে উপবনে? আমার হৃদয় নাচছে—'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।' শুধু কি আকাশেই মেঘের নীল অঞ্জন? তাই যদি হোতো তা হোলে কি এমন বেণী হোতো! আমার নয়নে লেগেছে নীলিমার নীল অঞ্জন। তৃণদলে বনছায়ে শুধু কি বৃষ্টির হরষ নেমে

এসেছে? আমার প্রাণের হরষ বিছিয়ে দিয়েছি আমি বনছায়ে তৃণদলে। আজ যে শুধু আকাশ মেঘে আকুল তা' নয়, আজ হৃদয় আকুল। আজ বুকের মধ্যে পুবে হাওয়া, বুক-জোড়া মেঘ। এই আকুলতায় হৃদয় আনমনা। বাইরের দেনাপাওনার হিসেব সে ভুলে বসেছে একেবারে। তাই—'ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়।' আজ হৃদয়-নদীর কূলে কূলে লহরী জেগেছে। বাধা বাধা মানছে না, মানছে না কূল। শুধু কি আকাশেই সজল ঘন নবীন মেঘের বর্ষণ, আজ হৃদয়-গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে রসের ধারা বরষিছে। অ-পরশ আঁচলের নব নীলিমা ছেয়ে দিলো বুক গোপন পরশে। মন মেঘের সংগী, উড়ছে মন হংস-বলাকার পাথায়। আজ কোনো নির্দিষ্ট সংকেত স্থলে যাবে না মন অভিসারে। আজ 'পথ ভুলিবার খেলা, মন হারাবার বেলা'। আজ দূর হতে দূরে অজানা হইতে অজানায় মনের অভিসার।

তিমির-নিবিড় রাতে যখন বৃষ্টি নাম্‌লো তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে। আকাশে তখন মত্ত প্রলাপে শ্রাবণ-ধারার প্লাবন চলেছে। আমার নিভৃত স্বপ্ন বাহির হোয়ে এলো বুক থেকে, দেহের সীমা গেলো সে পারায়ে। মন মিলে গেলো মত্ত হাওয়ার ছন্দের সঙ্গে।

বাইরে আর বাইরে থাক্‌লো না, বাহির ভিতর এক হোয়ে গেলো। দেহের অভিসারের পথে ঘুরে ঘুরে মন ক্লান্ত হোলো না। অসীম অন্তহীন অন্তর-আকাশে পাড়ি দিলো মানস-যাত্রী মন।

দেহ যার অন্ত সে রস, সে কবিতা ব্যর্থ। দেহ ও মনকে যে মিলিয়ে দিলো, বাঁধলো এক সুরে, দেহকে মন করে দিলো, হারিয়ে গেলো সীমা মন ও দেহের মধ্যে যে অনুভূতির পরশে—সে অনুভূতি ধন্য, সে কবিতা ধন্য। মাংসল কবিতা মাংসকে লোলুপ করে, মনকে স্পর্শ করবার সাধ্য তা'র নেই। সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা দেখবার ও দেখাবার সাধ্য তা'র নেই।

রবীন্দ্রনাথ সেই 'অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমার' কবি। তাঁর বর্ষার গানে ও কবিতায় ধরণীর সঙ্গে গগনের, প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের মিলন-ছন্দ আমরা শুনি। ব্যক্তির বেদনা বিরহ, অনির্বচনীয় অনুভূতি, তার মনের ঢেউ, প্রবাহ, চঞ্চলতা, নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যে তা'র হৃদয়ের ব্যকুলতা, সব শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নানা গানে, নানা কবিতায় আর বিশেষ কোরে তাঁর বর্ষার গানে আর কবিতায়। ব্যক্তির অন্তর-ব্যকুলতার ধ্বনি অনুপম গভীরতার সঙ্গে শুনিয়ে তিনি কিন্তু থেমে যান নি। সমস্ত মানব জাতির বরষার রূপও তাঁর দৃষ্টি এড়োতে পারে নি। শোনালেন তিনি বিশ্ব-মানবের বর্ষার রূপ :

'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে,
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠেছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে,
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।"

আজ মানবের হৃদয়ে ভীমা নৃত্য করছে, সে চলেছে ধেয়ে সীমা লোপ করতে করতে। আজ বক্ষে বক্ষে সংঘাতে বজ্রের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। চলেছে দলে দলে সুদূরের পানে, তাদের এই চলার শেষে যে ভীষণ জীবন-মরণ অপেক্ষায়মান তা' তারা জানে না। শোনো ঝড়ের বাণী। দিগন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে ভবিতব্যতা তা'র ভাষাহীন ব্যথা মানব-হৃদয়ের অন্ধকারে বাজছে, সামনে যে আসন্ন কাজ তা'র কালো কল্পনা ঘনায়ে উঠেছে দিগন্তে। যে মহাবরিষণ আসছে, মহাকাল-হাতে যার দুন্দুভি বাজছে, বিশ্বের আকাশে বাতাসে যার ইঙ্গিত, সেই, যুগান্তিকা বর্ষা ফেলেছে তা'র ছায়া কবির হৃদয়ে। বিশ্ব-মানবের এই বর্ষা-রূপ, এই ভীষণ-সুন্দর রূপ উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও একমাত্র তিনিই মানুষের এই সীমা-লোপ-করা নবজীবনের যাত্রাকে বর্ষার রূপে এঁকেছেন।

প্রকৃতি, ব্যক্তি ও বিশ্ব-মানব এই তিনটি ধারা এসে মিশেছে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানের মোহানায়। পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে আর কোনো কবি বর্ষাকে এমন অপরূপ রূপে এমন হৃদয়-হরণ রূপে মানুষের চিত্ত-লোকে অবতীর্ণ করাতে পারেন নি।

আষাঢ়ের পূর্ণিমা আজ। বর্ষা নেমেছে। আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। মেঘের ছায়া-মাখা দীঘির জল যেন তরল কালো মেঘ। জোনাকির বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দীঘির কালো জলের মেঘে। মনও আজ দীঘির জলের মতই কালো আকুলতায়। কেয়া কদম্বে রেষারেষি লেগে গেছে বনে উপবনে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আষাঢ় পূর্ণিমার দিন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট 'বৈতানিক' অনুষ্ঠিত উৎসবে পঠিত।

রেডিও

আসলে প্রভেদ অল্পই। টুইড্‌ল্‌ডাম আর টুইড্‌ল্‌ডি। এক অনুষ্ঠানের সঙ্গে অপর অনুষ্ঠানের যা মূলগত উৎকর্ষ অপকর্ষের তারতম্য তা উনিশ আর বিশ। কিন্তু কথা, গান আর নাটকের মধ্যে মানগত নিয়তার সর্বাপেক্ষা নিয়মিত পরিচয় মেলে কলকাতার নাটকানুষ্ঠানে। বক্তৃতা বিভাগে অন্তত দু'একজনের কথা স্মরণ করতে পারি যাঁদের রচনা সাহিত্য গুণসমন্বিত সাংবাদিকতা এবং বাচন শ্রুতিযোগ্য। সঙ্গীতেও এক পক্ষকালের অনুষ্ঠানের পর্যালোচনায় অন্তত দু'চার জন শিল্পীর সন্ধান মিলবে যাঁদের গান প্রায়শই আনন্দ দেয়। কিন্তু নাটক বিভাগটি একটি বিস্তৃত নিরবচ্ছিন্ন মরুভূমি।

প্রথম ও প্রধান আপত্তি বিস্তৃতি নিয়ে। শুক্রবারে বড়ো নাটক—বড়ো মানে প্রায় সীমাহীন। বুধবারে 'বিচিত্রা'—'সেলিউকাস্, তুমি সত্যই বলিয়াছ, বিচিত্র এই—ইত্যাদি'! তারপর, অর্থাৎ তার উপর আবার শনিবারে 'অবিস্মরণীয় ঘটনা'—বা এমনি কোনো অবর্ণনীয় অত্যাচার। দৈন্য দৈর্ঘ্য লাভ করে দৌরাত্ম্যের পর্যায়ে পৌঁচেছে! শ্রোতারা যার অল্প পেয়েই রুষ্ট তারই আয়োজন সব চেয়ে বেশি। অহেতুক এই শাস্তিটাকে মাঝে মাঝে মনে হয়, খবরের কাগজী ভাষায়, 'প্রতিশোধমূলক' বলে।

বেতার-নাটকের সর্বাঙ্গীন দৈন্যের সবখানি দায়িত্ব উপরিতন বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নয় মোটেই। অনেকগুলি কারণ কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু দীনতা যখন সর্বজনস্বীকৃত এবং কর্তৃপক্ষেরও কাছে অজ্ঞাত নয়, তখন যে সহজ সমাধান মূঢ়েরও মনে হবে তা তো এই যে নাটকের প্রকৃতির উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত তার আকৃতির আয়তনটাকে খাটো করা যাক। ব্যবস্থা হয়েছে বিপরীত। হাতের জ্যামটুকু এক টুকরো রুটির জন্যেই ছিল মর্মান্তিকরকম অপর্যাপ্ত। তাকেই তিন টুকরোর উপর বিছিয়ে দেওয়াতে জ্যাম হয়েছে অদৃশ্য, রুটি হয়েছে অভোজ্য।

অতএব বেতারের আশুতম কর্তব্য হচ্ছে সপ্তাহে তিন দিনের পরিবর্তে এক দিন মাত্র নাটকের ব্যবস্থা করা! এমন কি, পাক্ষিক বা মাসিক নাটক নিয়েও অভিযোগ করব না যদি কর্তৃপক্ষ কার্যে একথা সপ্রমাণ করতে পারেন যে পক্ষে বা মাসে একটির বেশি ভালো নাটক করবার মতো গুণসমৃদ্ধি কলকাতায় নেই এবং একটিকে ভালো করবার মতো ক্ষমতা তাঁদের নিজেদের আছে।

কথাটা মিথ্যা নয়। গুণসমৃদ্ধি সত্যি অত্যন্ত পরিমিত। সর্বকালে এবং সর্বদেশেই নাটকের প্রধান জন্মস্থান রঙ্গমঞ্চ। আমাদের সেই রঙ্গমঞ্চই প্রাণহীন অবস্থায় কোনো ক্রমে

সর্বশেষের আগে নিঃশ্বাসটুকু নিয়ে বেঁচে আছে, অর্থাৎ একেবারে মরে যায়নি এখনও। বেতার নাটকে যে সেখান থেকে প্রাণ সঞ্চারিত হবে তার সম্ভাবনা নেই। আমি তো বলি, কলকাতার বেতার নাটকের উপর কলকাতার মঞ্চের প্রভাব অবিমিশ্র অভিশাপ হয়েছে। 'ধর্মমূলক' আখ্যা ধারণ করে যে বস্তুগুলি মঞ্চ থেকে বেতারে স্থানান্তরিত হয় তাতে আর যে ধর্মই রক্ষিত হোক, নাট্যের ধর্ম রক্ষিত হয় না। বেতার নাট্যের তো নয়ই।

বেতার এখনও নাবালক। শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও। এর গতিবিধি বালকোচিত, এর খামখেয়ালি বোঝা দায়। তার উপর গম্ভীর শিল্পীদের অধিকাংশই একে কলা মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দিতে আজো নারাজ। বিলাতে বা আমেরিকায়ও অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক প্রতিভাবান শিল্পীই এই নতুন মাধ্যমটিকে সহানুভূতি ও উৎসাহের সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। অপর কোনো ক্ষেত্রের প্রমাণিত সৃজনী প্রতিভা আজো তেমন নিয়োজিত হয়নি বেতারের উদ্দেশ্যে। বেতারে সবাই পথিক, স্থায়ী বাসিন্দা কেউ নয়। সবাই ওখানে যান উপরি দু'টো নগদ পয়সার জন্যে, নিজেকে উৎসর্গ করতে নয়—যেমন করে লেখক এবং অন্যান্য সকল কলার সকল সত্যিকার কলাকার। বেতার আজো কোনো সত্যিকার শিল্পীর বিবাহিতা সহধর্মিনী নয়, সে শুধু দু'একটা অলস সন্ধ্যার অবসর-বিনোদনের লঘু সঙ্গিনী। শিল্পী আর তার মাধ্যমের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ হলে তা থেকে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হলে তার মুখ থাকে না মাথা উঁচু করে চলবার। বেতার নাটক যে কলঙ্কিত সে জন্যে দায়ী কর্তৃপক্ষ নয়, দায়ী আমাদের সাহিত্যিকরা যাঁরা প্রচুর সম্ভাবনাবিশিষ্ট এই মাধ্যমটিকে হেলাভরে অবজ্ঞা করলেন।

আমার পরিচিত দু'চারজন সাহিত্যিক এই অবজ্ঞার যে কারণ প্রদর্শন করেছেন আমি তা গ্রহণ করতে অপারগ। তাঁরা এই মাধ্যমটিকেই গুরুত্ব দিতে রাজী নন—এতে মান নেই, এর খ্যাতির স্থায়িত্ব নেই, এ-মাধ্যমে সত্যকার সৃষ্টি সম্ভব নয়, এখানে নানা আইনকানুনের গণ্ডী, আমাদের সময় নেই এই ছেলেখেলার জন্যে ইত্যাদি। যুক্তিগুলির সব ক'টিই পুরোপুরি অমূলক নয়, কিন্তু এর সবগুলিই আরেকটি মাধ্যম সম্বন্ধে সমান সত্য যেখানে তাঁদের দীর্ঘ সারি দেখলে হাসি পায়। সেটি সিনেমা। সেখানে তাঁরা সবাই গেছেন। কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বাস করছেন। বিবাদ করিনে তা নিয়ে, কেননা এই যাওয়ায় সাহিত্যও দীন হয়নি সিনেমাও ধনী হয়নি। হাতিয়ারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আসল কারণ তাঁদের শক্তির শোচনীয় পরিমিতি, নতুন মাধ্যমের জন্যে নতুন সৃষ্টি করবার মর্মান্তিক অক্ষমতা।

আরো একটি বড়ো কারণ আছে সাহিত্যিকদের বেতারে অনুপস্থিতির। সেটি হচ্ছে পারিশ্রমিকের নির্লজ্জ এবং অপমানকর সামান্যতা। প্রথম অভিনয়ের, এবং বিশেষ করে পুনরাভিনয়ের, সম্মান-দক্ষিণার অংশটা সত্যি এতই অসম্মানজনক যে বিশেষ করে বেতারের জন্যে লিখতে সাহিত্যিকরা যে অনুপ্রেরিত হ'ন না সেজন্যে তাঁদের দোষ দিতে বাধে।

কর্তৃপক্ষ বলেন, 'বাঁধা বরাদ্দের বাইরে যাওয়ার এখতিয়ার নেই আমাদের। মাথা যদি নিতে হয়, নাও মাথাইর।'

এই সমস্যার অনেকাংশের সমাধান হতে পারবে নাটকের সময় সংক্ষিপ্ত করলে।

কিন্তু বেশি দক্ষিণা দিলেই যে আমাদের সাহিত্যকরা আগামী কাল থেকেই এক একটি Chef D'oeuvre সৃষ্টি করতে থাকবেন এমন সম্ভাবনা আদৌ নেই। যাঁরা সৃষ্টি করছেন না তাঁরা তাঁদের প্রতিভাহীনতার জন্যেই করছেন না, পুরস্কারের পরিমিতির জন্যে নয়। অল্প কিছু দিন আগেও বাঙালা লেখক টালাতে বা ঢাকুরিয়ায় বাড়ী তুলতে পারতেন না, বহু সাহিত্যিক অনাহারী ছিলেন, কিন্তু সেজন্যে বাঙলা সাহিত্যকে অনাহারে থাকতে হয়নি। সৃষ্টির প্রেরণা যাঁদের ছিল তাঁরা ঠিক সৃষ্টি করে গেছেন। গোবিন্দ দাস জমিদার হলেও রবীন্দ্রনাথ হতেন না। আসল কথা প্রেরণা

সেই প্রেরণা আসবে কোথা থেকে? যেখান থেকে সকল সৃষ্টির প্রেরণা আসে সেখান থেকে; যেখান থেকে অল্প কয়েকজনের কাছে সেই আশীর্ব্বাদ আসে কিন্তু সেখানকার ঠিকানা সেই ভাগ্যবানেরাও জানে না। কিন্তু সেটাতেই যথেষ্ট নয়। সেই প্রেরণার বিকাশের জন্যে চাই অনুকূল পরিবেশ, তার অভ্যর্থনার জন্যে চাই যথাযোগ্য আয়োজন, তার পরিস্ফুটনের জন্যে চাই অভিজ্ঞের নির্দেশ। এই তিনটি জিনিস দেবার দায়ীত্ব কর্তৃপক্ষের এবং এই দায়ীত্বপালনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন কেননা আন্তরিক প্রয়াসই করেননি। কেন করেন নি তার একেবারে গোড়ার কারণ আমার পূর্ব প্রবন্ধে (চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬) সবিস্তারে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

বর্ত্তমান অনুৎসাহ নিয়েও কিন্তু এখনকার চাইতে ভালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব। তার জন্যে চাই বেতার-মাধ্যমের প্রতি কর্মচারীদের আরো অল্প একটু নিষ্ঠা, নাটকের ভালো মন্দের প্রতি অল্প একটু মনোযোগ, নাটকের শিল্পীচয়ণে অল্প একটু সতর্কতা আর বেতারের লেখকদের প্রতি অল্প একটু শ্রদ্ধা।

এক, বোখারী-যুগে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অনুষ্ঠানের জন্যে সমগ্রভাবে দায়ী করা হোতো বেতারে কর্মচারীর নাম ঘোষিত হোতো এবং চয়ন থেকে প্রচার পর্য্যন্ত প্রতি স্তরের প্রশংসা বা দোষ তাঁকে স্বীয় স্কন্ধে বহন করতে হোতো। প্রশংসার প্রতি অনুরাগ ও নিন্দার ভয় তখন কর্মচারীকে সজাগ রাখতো। ট্রিপ্লিকেটে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করানো তাই তার সব সময় নিয়োজিত হোতো না এবং অনুষ্ঠানের ক্রমোন্নতি হবার একটি উপায়ের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ছিল এই বিধানে। আজ সেই উৎসাহের, নিষ্ঠার আভাসমাত্র দেখতে পাইনে।

দুই, নাটক-চয়নে বেতারকর্মচারীর বিচারক্ষমতার চাইতে শ্রদ্ধাশীলতার উপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বেতারগুণবিশিষ্ট বা বেতারসম্ভব নাটক ঠিক কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমাদের দেশে অত্যন্ত অল্প লোকেরই সুস্পষ্ট কোনো ধারণা আছে। তেমন লোক বাইরে ক'জন আছেন জানিনে, কলকাতা কেন্দ্রে যে এমন লোকের আধিক্য নেই তা শ্রুতি ও দর্শন থেকে নিঃসন্দেহরূপে সংগ্রহ করেছি। অতএব? অতএব, এমন নাটক বা কাহিনী

বেতারে পরিবেশনের জন্যে নির্বাচন করা হোক যাতে বেতারগুণ না থাকলেও অন্তত সাহিত্যগুণ থাকবে। অর্থাৎ, মোটামুটি একটা গল্প বা পরিস্থিতি থাকবে এবং তার ভাষা উচ্চ স্তরের হবে। এমন প্রচেষ্টা যে সফল হতে পারে তার একটি দুর্লভ প্রমাণ মিলেছিল গত মার্চ মাসে। সেই অনুষ্ঠানটিতে কাহিনী ছিল সামান্যই, বেতাররূপারোপে বৈশিষ্ট্য ছিল সামান্যতর, কিন্তু কেবলমাত্র সাহিত্যগুণে এবং সংযত পরিবেশনে তা সকল শ্রেণীর বহু শ্রোতার প্রশংসা লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের এবং পরবর্তী বহু লেখকের এমন অসংখ্য কাহিনী বা কাহিনীর টুকরো আছে যা কুশলী শিল্পীর হাতে বেতারের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। এক কথায়, নাট্যগুণ যতদিন পর্যন্ত দুর্লভ ও অনির্দেশ্য থাকবে ততদিন সাহিত্যগুণই যাচাইয়ের মান হলে ভালো হয়।

তিন, এই প্রশ্নটিও অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে, বিশেষ করে নাটকের সময়ের পরিমাণের সঙ্গে জড়িত। কয়েকটি কণ্ঠ এত বেশি শোনা যায় যে রসহানি ঘটে। যে নিঃসন্দেহ অভিনয় পারদর্শিনী সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টা ঘোষণা করেন—'এবারে আপনাদের দু'খানি শ্যামা-সঙ্গীত শোনাবেন শ্যামাঙ্গিনী বর্মণ'—তাঁকেই আবার শুক্রবারের নাটকে নায়িকার অংশ গ্রহণ করতে বললে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়—কেননা তাঁর অভিনয় ক্ষমতার অনেকখানি হারিয়ে যায় তাঁর কণ্ঠের অতিশ্রবণে, যদিও তাঁর অভিনয় সর্বদাই কলাসম্মত ও কণ্ঠ সর্বদাই মধুর। ঘোষিকা বহু মিলতে পারে, কিন্তু নাট্য প্রতিভা কেন অপব্যয়িত হবে ঘোষণায়? এ গেল এক দিক। অপর দিক হচ্ছে পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে যুদ্ধ করা, অর্থাৎ অযোগ্য শিল্পীদের নেওয়া। এমন কয়েকজন বেতারে 'অভিনয়' করেন যাঁরা ঠিক কী করছেন বোঝা মুস্কিল—'ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত' পড়ছেন, না কি আর কিছু!

চার, সময় সংক্ষেপের পরেও বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে বেতার নাটকের জন্যে লেখকদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হবে তা পর্যাপ্ত হবে না। আমার কথা এই যে গুটি কয় অতিলোভী সাহিত্যিককে বাদ দিলে সাধারণভাবে বাঙ্গালী লেখকরা আজো অর্থগৃধ্ন নন। আজো এমন লেখক—নবীন এবং প্রবীণ—আছেন যাঁরা অর্থ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসকে পুরস্কার বলে মানেন। আকাশ-ছাঁয়া ভ্রূযুগল ঈষদাবনমিত করলেই দেখা যাবে যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি হয় পাঠকের সহিত সংযোগ স্থাপন তা'হোলে বেতার ছাপার অক্ষরের চাইতে প্রশস্ত সেতু। ইংরেজিতে ওরা বলে কোল্ড্ প্রিণ্ট্, শীতল মুদ্রন। বেতার হচ্ছে উষ্ণ করমর্দন। এর সেবায় সাহিত্যিকরা সানন্দে অগ্রসর হবেন, যদি তাঁরা একথা জানতে পান যে তাঁদের যোগ্য সম্মান মিলবে গারষ্টিন প্লেসে। মোটা চেক নয় (সেটা কর্মচারীদের জন্যে থাক), ফুলের মালা নয় (সেটা নেতাদের জন্যে থাক), বুফে ডিনারে নিমন্ত্রণ নয় (সেটাও থাক আই-সি-এস্‌দের জন্যে)—একটু সম্মান, একটু শ্রদ্ধা, একটু আন্তরিক স্বীকৃতি শুধু। এটুকুও মিলবে না?

নীলিমা ঘোষ

সিনেমা

পরিবর্তন—ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স

সিনেমার মধ্যে লোকে কী রস খোঁজে তার সম্বন্ধে বাংলার প্রযোজক মহলে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে। যতই মনগড়া হোক সে ধারণা যে বদ্ধমূল তাতে সন্দেহ নেই। তাই নামের ও ঘটনার অদল বদল সত্বেও আদতে সব বাংলা ছবিই এক—একই চরিত্র, একই ছক, একই রস। উনিশবিশ থাকলেও তাতে পরিবর্তন নেই। মানুষের মন বাংলার প্রযোজকের কাছে এমন কিছু বিচিত্র বস্তু নয়, কড়ায় গণ্ডায় তার হিসেব কষতে পয়সা লাগে না। বিশেষতঃ সিনেমার ক্যাশবাক্স ঝঙ্কৃত করে রাখে যে জাতের লোক তারা হয় পাড়ার মালকোঁচামারা বেকার, নয় বিরসবদন কেরাণী, নয় সরগরম ছাত্র কিম্বা হলুদ ছোপধরা নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের বৌ। এদের মন জোগাবার জন্য বিনিদ্র রজনী যাপন করার প্রয়োজন আমাদের পরিচালক মহলের নেই, কেননা এদের পাওনা চুকিয়ে দিতে চাই শুধু দুফোঁটা অশ্রুজল চার হাজার ফিট গান একটি স্লিপিং পায়জামা পরা মেয়ে, খানিকটা বক্তৃতা, কিছুটা জমাট ভাঁড়ামি। ছবিকে খিচুড়ী করতেই হয় কারণ দর্শক হরেক রকমের। কান্নায় যদি চিঁড়ে না ভেজে তো বক্তৃতা মজুদ, ভাঁড়ামিতে না কুলোলে 'আধুনিক' গানের পসরা; তারপর স্লিপিং পায়জামা পরা মেয়ে দেখে যে লোক ভিড়বে না তাকে নিয়ে বাংলা ছবির কারবার নয়; সে নিতান্তই 'ক্লাস' ব্যক্তি, 'মাস্' নয়; তার জন্য ছবি করার মতো বাড়তি টাকা এই মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে মিলবে কোথায়। 'পাবলিক' কী চায় তা আমরা জানি।'

কিন্তু আশ্চর্য বিষয় এই পরম অবজ্ঞার পাত্র যে লোক, তার মনের চাবিকাঠি পকেটে রেখেও আমাদের প্রযোজকদের হাউসে হাউসে ক্যাশ বাড়ন্ত। একের পর এক ছবি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত যাচ্ছে। 'পাব্‌লিক' যা চায় তাই দুহাতে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, অথচ 'পাবলিক' তা নিচ্ছে না। সম্পাদকীয় আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল। ক্রাইসিস একেই বলে।

কলকাতার গলিতে গলিতে হিন্দি ছবির সতেজ গণিকাবৃত্তি বাঙালীর মান বাচানো নাচগানকে ভূমিসাৎ করে দিয়েছে। দেশাত্মক বক্তৃতার সঙ্গে যৌন আবেদন চলে না, ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচের চেয়ে নাচ সোজাসুজিই ভালো। বোম্বাই-এর ছবি

আঙ্গিকের দিক থেকে ভালো, রসের দিক থেকে নীচু, কিন্তু সব মিলিয়ে জোরালো। সুতরাং এ রসের যে রসিক সে বোম্বাই-এর ঘরে চুরি করতে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী।

আসল আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে 'পরিবর্তন' সাধারণের ভালো লেগেছে। নীরব ভেড়ার পাল বলে যে পাবলিককে বাংলা সিনেমাকারেরা জানতেন তার হল কী? পাবলিক যা চায় বলে জানা ছিল তার সবিশেষ চিহ্ন 'পরিবর্তন'-এ নেই। অথচ নানা পাবলিকতোষণের ছবির লোকসানের বাজারে বসে 'পরিবর্তন'-এর বাজার সরগরম। এবার বোধ হয় সূর্যাস্তের পরও বাংলার প্রযোজককে ভাবতে হল।

'পরিবর্তন'-এ বোম্বাই-এর নাচওয়ালী নেই, বাংলার বক্তৃতায় কান্নায় মেশা ভাঁড়ামি নেই, নীতিবাগিশ যৌনতা নেই। অর্থাৎ কী বাংলার কী বোম্বাই-এর কোনো গণিকা-বৃত্তিই নেই। 'পরিবর্তন'-এর প্রযোজক জনসাধারণকে একটু ভালোই ধরে নিয়েছেন। তাতে তিনি ঠকেননি কারণ তিনি শুধু 'ভালো ছবি' করেননি। ভালোভাবে ছবি করেছেন। ভালো জিনিসের মধ্য থেকেও আনন্দসৃষ্টি করা যায় যদি তার বিদ্যাটা আয়ত্ত থাকে। 'পরিবর্তন'-এর কর্মকর্তারা সেই বিদ্যা অনেকদূর পর্যন্ত আয়ত্ত করেছেন সন্দেহ নেই। ভেজাল তাঁদেরও মেশাতে হয়েছে, কখনো দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে কখনো নতুন পথ চিনতে না পারার ফলে। তাই ছবি হিসাবে 'পরিবর্তন'-এর মূল্য ততখানি না হলেও পরিবর্তনের পথে প্রথম পরীক্ষা হিসাবে তার মূল্য অসীম। লোক যে অবজ্ঞার পাত্র নয়, ভালো ভাবে বলা হলে ভালো গল্পও সে নিতে রাজী, এটা প্রমাণ করে 'পরিবর্তন'-এর কর্মকর্তারা বাংলা ছবির বিশেষ উপকার করেছেন।

ছবি হিসাবে 'পরিবর্তন'-এর মূল্য তেমন নয় কেন তার কারণ একাধিক। কাহিনীর দিক থেকে এই ছবিতে বিশেষ মৌলিকত্ব নেই। 'বয়েজ টাউন' (মার্কিণ), 'ল কাজ ও রসিয়োনল' (ফরাসী) এবং 'রোড টু লাইফ' (রুশ) ইত্যাদি ছবির কাঠামোর সঙ্গে 'রামের সুমতি' বা 'কাশীনাথ'-এর প্রথম ভাগ মিশিয়ে এমন গল্প খাড়া করতে আমি আপনিও পারি। অভিনয়ে চমকপ্রদ কিছু নেই, বস্তুতঃ প্রধান বালক-ভূমিকায় অজয়ের অভিনয় বেশ দুর্বল। পরিচালকের নিজের অভিনয়ে সংযম ও সহজতা আছে কিন্তু প্রকাশের নৈপুণ্যে কমতি আছে। অভিনেতা হিসাবে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষিত নন। আঙ্গিকের দিকটাও জোরালো বলতে পারি না, কারণ ক্যামেরার কাজ অসমান, ছবি ফোটানো বা ছাপা কোনোটাই আগাগোড়া প্রথম শ্রেণীর নয়। চিত্রনাট্যে সুপার-ইম্পোজিশন (যাকে চলিত ও খানিকটা ভুল অর্থে 'মন্তাজ' বলা হয়) নিয়ে অনর্থ বাড়াবাড়ি ও অজ্ঞতার পরিচয়। ছেলেদের দুষ্টবুদ্ধি দেখাতে গিয়ে একই জাতের ঘটনার ভিড়ে কোথাও কোথাও পুনরাবৃত্তির ফলে রসভঙ্গ হয়, গল্প যেন এগোতে পায় না। বক্তৃতার অংশগুলি অন্যান্য ছবির চেয়ে অনেক সংযত হলেও বই-ঘেঁষা একটা আড়ষ্টতার ভাব পুরোপুরি যায়নি। বক্তব্যের বিচার করতে গেলে বলতে হয় শিক্ষকের গতি না হলে ছাত্রের গতি কোথায়? স্কুলে স্কুলে এমন 'নতুন স্যার'-দের প্রাদুর্ভাব হবে কোত্থেকে? তাছাড়া যে

বিগলিত ভাবস্রোতে সচরাচর বাংলা ছবি তলিয়ে যায় 'পরিবর্তন'-এর শেষের দিকে তাই আবার ফুঁড়ে উঠেছে। শক্তি নামে ছেলেটির চেহারা এমিতেই করুণ, তার ওপর সে খোঁড়া, তার ওপর সে ঝিয়ের ছেলে (বড়লোক গিন্নী ঝিয়ের ওপর যথারীতি অত্যাচার করে)—এমন ছেলের করুণ গলায় কেবলি হিতোপদেশ দেওয়া চাই, অবশেষে গাড়ীচাপা পড়া চাই, হাসপাতালে সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে চিরবিদায় নিয়ে যাওয়া চাই। শোকে তার মা উন্মাদ, 'খোকা' নাম ধরে বাগানে বাগানে ঘোরে। দর্শককে এভাবে হাত পা বেঁধে মার না দিলে কি চোখে জল আনা যেত না? আলাদা করে দেখলে শেষের সবকটি ঘটনাই বিশ্বাস করা চলে কিন্তু সব সব মিলিয়ে যেটা হয় সেটা নিতান্তই সাবেক কালের থিয়েটারী করুণরস। পরিবর্তনের স্পর্শ এখানে মোটেই লাগেনি। শক্তির ছবির সামে দাঁড়িয়ে অজয়ের ভাবার্দ্র বক্তৃতাও অত্যন্ত বিরক্তিকর।

এরকম ত্রুটির ফর্দ আরো বাড়ানো যায় কিন্তু তাতে সার্থকতা নেই কেননা সব মিলিয়ে 'পরিবর্তন' মনে রীতিমতো রেখাপাত করে; অধিকাংশ বাংলা ছবির সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। স্কুলের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব সত্যেন বসু পুরোপুরি ধরতে পারেননি, কিন্তু যে দুটি দুর্লভ বস্তু তাঁর রচনায় এসেছে তা হচ্ছে বাস্তবতা আর সজীবতা। তাঁর গ্রামকে গ্রাম মনে হয়, স্কুলকে স্কুল মনে হয় ছাত্রদের ছাত্র মনে হয় হাসবার জায়গায় হাসিই পায়, কান্না আসে না। 'পরিবর্তন'কে প্রায় অনুষ্ঠিত (re-enacted) ডকুমেণ্টারী বলা চলে (সেজন্যই শেষাংশটা সবচেয়ে দৃষ্টিকটু)—সত্যিকারের স্কুল ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য বাস্তবতার স্বাদটা সজীব! যথেষ্ট আউটডোর ও লং শট থাকার ফলে ছবিতে বেশ একটা খোলা হাওয়ার ভাব এসেছে। মেক্-আপ্-এর ব্যবহারে পরিচালক রীতিমতো বুদ্ধি পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের দেশে কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ মাঝামাঝি। নানা রঙের এই সংমিশ্রণ যদি ছবিতে বজায় রাখা যায় তাতে একটা নাটকীয়তা দিতে পারে। সচরাচর বাংলা ছবিতে এই জ্ঞানটার পরিচয় পাওয়া যায় না, সব মুখকেই সমান ফর্সা বানিয়ে ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইয়ে দেওয়া হয়। 'পরিবর্তন'-এ সত্যেন বসু ছেলেদের প্রত্যেকের মুখের আলাদা চেহারাকে (skin-texture) বজায় রেখে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছেলেদের অপকর্মগুলি তাঁর হাতে বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকের দৃশ্যগুলিতে বেশ একটা বাঙালী রিয়্যালীটির সন্ধান পাওয়া যায়। এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যের গতির মধ্যে একটা সহজ ছন্দ আছে। শিক্ষার সমস্যার দিকে দর্শকের দৃষ্টিকে যে এই ছবি আকর্ষণ করে তা বলাই বাহুল্য।

ভবিষ্যতে 'পরিবর্তন'-এর স্রষ্টাকারেরা নিশ্চয়ই আরো ছবি তৈরী করবেন। অন্যান্য পরিচালকদের মতো তাঁরা যদি সহজেই আত্মসন্তুষ্ট হয়ে জাঁকিয়ে না বসেন তবে তাঁদের উত্তরোত্তর উন্নতি অনিবার্য। একটিমাত্র ছবির আঘাতে বাংলা সিনেমার অচলায়তন ভাঙবার নয়।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

নাটক

এ্যামেচার অভিনয়

'এ্যামেচার প্লে'র পরিভাষা 'সৌখীন অভিনয়'এ আমার আপত্তি আছে, এ্যামেচার আর্টিষ্ট অবৈতনিক হতে পারেন কিন্তু অভিনয় তাঁর কাছে সখের মত ফুরফুরে ব্যাপার নাও হতে পারে, বরং উল্টোটাই। বিধিমত চুক্তিরক্ষা ও কোনক্রমে নামাম্বপাতিক যশ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেই পেশাদার মঞ্চাভিনেতার দায় শেষ, অন্যদিকে স্বতীব্র যশোলিপ্সা ও উন্নত নিষ্ঠাবোধ, বিশেষ করে সমঝদার শ্রোতার মনোহরণের জন্য সাধ্যমত ভালো অভিনয় করতে এ্যামেচার অভিনেতা সাধ্যের কার্পণ্য করেন না। নাট্যরসিক বিদ্বজ্জনের কাছ থেকে সবিনয়ে উপদেশ গ্রহণে তাঁরা আগ্রহশীল, মাসাধিক কালের মহড়ার সাধনা যদিওবা থাকে, শতরজনী জাগরণের ক্লান্তি থাকে না চোখে। নাট্যপীঠ তাদের কাছে উৎসাহের বাসর, নইলে আজ যাঁরা সূর্য-চন্দ্র-তারকা হয়ে মঞ্চ ও চিত্রের আকাশে দেদীপ্যমান, একদিন তাঁরা সবাই ছিলেন অবৈতনিক অভিনয়ের কালো ডুপের অন্তরালে।

কিন্তু, সাম্প্রতিক এ্যামেচার অভিনয়ের সংগে যাঁদের যোগাযোগ আছে তাঁরা এ উক্তির প্রতিবাদ করবেন হতাশার সংগে, বাংলা রংগমঞ্চের যবনিকা উঠেছিল এ্যামেচার অভিনয় দিয়েই। মধ্যযুগীয় ধনীর উদার সংগেই মঞ্চাভিনয়ের গোড়াপত্তন, সেদিন সমাজের নিমন্ত্রিত গুটিকয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অভিনয় দেখার আনন্দ। অভিনয়কে পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন গিরিশবাবু, টিকিট ক্রেতা মাত্রেই রংগালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করে, তা'বলে এ্যামেচার অভিনয় বন্ধ হ'ল না, পেশাদার অভিনয়ের পাশাপাশি ধারাবাহিক গতিতেই অব্যাহত রইল। নতুন আংগিক, সাময়িক বিষয়বস্তু ও অভিনব অভিনয়-ভংগী দিয়ে প্রভাবিত করল পেশাদার রংগমঞ্চকে, যোগান দিল নতুন নতুন প্রতিভাবান অভিনেতা, বিষয়-সার্থক নাটক প্রভৃতি। বর্তমানে কিন্তু এ্যামেচারের সংগে পেশাদারের সে সম্মানজনক সম্পর্ক আর নেই। প্রভাবিত করা তো দূরের কথা, সাধারণ রংগালয়ের উচ্ছিষ্ট বস্তাপচা নাটক ও নামজাদা অভিনেতাদের মূদ্রাদোষগুলো পর্যন্ত অনুকরণ করার মধ্যে এ্যামেচার অভিনয়ের কৈবল্য সিদ্ধি।

অথচ, পেশাদার রংগমঞ্চের তুলনায় নতুনত্ব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এ্যামেচার সম্প্রদায়ের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধন। টিকিটঘরের দিকে নজর রাখবার দরকার হয় না। সাধারণত স্কুল-কলেজ-অফিসের ফাণ্ড, বারোয়ারী পূজার চাঁদা বাবদ উদ্বৃত্তঅর্থ অথবা

সাহায্য অনুষ্ঠানের আয়োজনে পরিজন-বান্ধবদের গছানো টিকিটের টাকাই তাদের উৎসাহের উৎস। কিন্তু এর ফল আবার বিপরীতও হতে পারে, অর্থাৎ শ্রোতাদের অর্থ নষ্টের ক্ষোভ না থাকায় অভিনয় কর্তৃপক্ষ রংগালয়কে করে তোলেন দায়ীত্বহীনতার লীলানিকেতন। সম্প্রতি এ্যামেচার অভিনয় যে ত্রুটীগুলি দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত তা হচ্ছে: প্রচারিত সময়ের নির্দেশে পটোত্তলন ঘটে না। অভিনেতাদের মধ্যে দু'একজন থাকেন নিপুণ, অবশিষ্ট নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর। তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার কোন চেষ্টাও থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে মহড়া দেওয়া হয় না, সংলাপ মুখস্ত হয় না। স্মারকের সাহায্যে ষ্টেজে বাজীমাৎ করার সৌভাগ্য পোষণ করেন মনে, ফলে climaxএর সময় হয়তো বিশৃঙ্খল ঘটে। অভিনয়ের total effect যায় রসাতলে। স্মারকের উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ, আনকোরা নতুন অভিনেতার স্বাভাবিক দৌর্বল্য, আবহ-সংগীতের গুরুমূল্য সম্বন্ধে অচেতন, পুরুষ দিয়ে নারীর ভূমিকায় অভিনয়।

দু'মাসে ছ'মাসে অভিনয় করার জন্যই উল্লিখিত ত্রুটীগুলি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ ত্রুটীগুলি থেকে মুক্ত হতেই ব্যবস্থাপকরা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পড়েন। ঘন ঘন অভিনয় করার আয়োজন করলে উক্ত ত্রুটীগুলি তো অপনোদিত হবেই, নতুন কিছু করার প্রেরণাও আসবে। গত সংখ্যায় জানিয়েছি বর্তমানে এ্যামেচার নাট্যসম্প্রদায়ের দায়ীত্ব শুধু সুষ্ঠভাবে নাটক মঞ্চস্থ করা নয়, রংগমঞ্চের ক্ষয়িষ্ণুতাকে নিয়ন্ত্রিত করা। সুতরাং ত্রুটীগুলি মোচন করলেই কর্তব্যের ইতি নয়, আরো কিছু।

পুরুষ দিয়ে নারীর ভূমিকায় অভিনয় যথা সম্ভব বর্জন করা উচিত। এতে দর্শকের কল্পনাবৃত্তি কষ্ট পায়, সংগঠন ক্ষমতার জোরে ভূমিকাপযোগী শিক্ষিতা মহিলার যোগাযোগ দুর্লভ নয়।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

সমালোচনা

বাঁশের কেল্লা—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। দুই টাকা চার আনা।

রোম্যান্টিক গল্প বলায় এবং স্বচ্ছ সহজ, আবেগময় প্রাণবন্ত গদ্য রচনায় বাংলা কথা-সাহিত্যে মনোজবাবুর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বাঁশের কেল্লা'য় সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ। গল্প গড়ে তোলবার কলাকৌশলও তাঁর বহুদিনের অভ্যস্ত; এ গ্রন্থেও সে অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। গ্রাম্য সমাজ জীবনের প্রবহমান ধারার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ট; সে প্রমাণ তিনি আগেও অনেক বার দিয়েছেন, এবারও পেলাম।

একটি সম্পন্ন জীবন্ত গ্রামের চেতনাকে কেন্দ্র করে এই গল্প। সেই চেতনা উনবিংশতকের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের আলোড়ন থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং রূপ নিয়েছিল বাঁশের কেল্লার প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে—নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। তারপর সেই ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে দিনে দিনে গ্রাম্যজীবনের বিচিত্র তন্তুর সঙ্গে জড়িত হ'য়ে গ্রাম্য প্রতিরোধ বিবর্তিত হ'য়েছে স্বাধীনতার সংগ্রামে। আভাসে ইঙ্গিতে মনোজবাবু তার ইতিহাস বুনেছেন এই গল্পের মধ্যে; সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন যুদ্ধ, চোরাবাজার, ব্যক্তিগত লাভ ও লোভ সবকিছু মিলে গ্রাম্য ভদ্র জীবনের চরিত্রটিকে ভেতর থেকে খেয়ে দিয়েছে ঘুণে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নূতন চেতনার হাওয়া এসে লেগেছে গ্রামে, নূতনতর শ্রেণী-শক্তি গড়ে উঠেছে বাগ্দী চাঁড়াল পাড়ায়, তার ইঙ্গিত দিতেও ভোলেননি। মনোজবাবু সচেতন লেখক সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে হয়, সর্বত্রই যেন একটু বড় চড়িয়েছেন বেশি, দূর থেকে দেখেছেন বস্তুর রূপকে, আইডিয়াকে মনে করেছেন বস্তু বলে। তার ফলে গল্পবর্ণিত ঘটনা ও চরিত্র খুব স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে মনকে অধিকার করেনা, ইতিহাসের দূরগত ধ্বনি বলে মনে হয়।

ছোট্ট এই উপন্যাসটিতে চরিত্র অনেক, ঘটনার ভীড় বিস্তর, এবং গল্পের গতি অত্যন্ত দ্রুত ও কেমন যেন মনে হয় সমস্ত গল্পটাই সিনেমেটোগ্রাফিক্—মনোজবাবু কি সিনেমার দিক চোখ রেখে গল্পটি লিখেছিলেন? তাতে ক্ষতি বা অভিযোগের কিছু নেই; এ-বই সিনেমাতে উৎরাবে বলে আমার ধারণা। কিন্তু এই ধরণের গল্পবলা উপন্যাসের আঙ্গিকের পক্ষে খুব উপযুক্ত কিনা তা'তে আমার সন্দেহ আছে। জানা কাহিনী চোখের সামনে দিয়ে দ্রুতগতিতে ভেসে যায়, কোনোটাই খুব দাগ কেটে বসতে চায় না। তা ছাড়া একটা কেন্দ্রীয় মূল বক্তব্যের গাঁথুনী যেখানে নেই সেখানে চরিত্র ও কাহিনীগুলি একটা সমগ্রতা ধারণ করে না, কেমন যেন টুকরো টুকরো ছাড়া ছাড়া হ'য়ে থাকে। 'বাঁশের কেল্লা'য়ও

এই ধরণের একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব থেকে গেছে বলে আমার' ধারণা। এক দুর্গা ও নীলকমল মাষ্টারের চরিত্র ও চরিত্রাশ্রিত ঘটনা ছাড়া আর কোনো চরিত্র বা ঘটনা খুব সুস্পষ্ট তুলিতে আঁকা যেন নয়।

কিন্তু মনোজবাবুর গল্প বলবার ভঙ্গীর তারিফ্ না করে পারা যায় না। ভাষার মুন্সীয়ানা তো আছেই; তার স্থানীয় রূপ ও প্রাকৃতিটিকে কি করে ব্যবহার করতে হয়, তা তিনি ভালই জানেন। তা'ছাড়া, সংলাপ-রচনা, বিচ্ছিন্ন কাহিনীর বিন্যাস ও সূত্ররচনা, গল্প আরম্ভ ও শেষ করার কৌশল ইত্যাদি সবিস্ময় প্রশংসার উদ্রেক করে। এক্ষেত্রেও মনে হয়, যে কলাকৌশল 'বাঁশের কেল্লা'য় তিনি ব্যবহার করেছেন সেটি সিনেমা-গল্প রচনার। এ-বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

নীহাররঞ্জন রায়

শীতে উপেক্ষিতা—রঞ্জন। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা আট আনা।

যে ধারণা সংকল্প ও রচনা রীতির আকর এই বইটি সে সবই সূচনার জিনিষ; নিজের নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধির ভূমিতে এখনও পৌছতে পেরেছে মনে হ'ল না। কিন্তু লেখকের ভাবনা ও রীতি প্রথম বইয়েই একটা পথ ঠিক ক'রে নিয়েছে, যা তাঁর নিজের। রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরোনো কথা' বাদ দিলে বাংলা দেশে কোনো পূর্ব্বজ গাল্পিক বা উপন্যাসিকের ধাঁজ থেকে এ বইটির ধরণ আলাদা। আমার মনে হয় চারুচন্দ্রের বইয়ের একটা বিশেষ প্রকর্ষ এবং ঠাকুর সাহিত্য (তার কোনো কোনো অধ্যায়ে) সামনে ছিল ব'লে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দু'চারটে বইয়ে (বিশেষতঃ 'দেশে বিদেশে' ও 'দৃষ্টিপাত') গল্প-মন্তব্য-জর্ণালিজমের বিচিত্র বিন্যাস ক্রমেই নতুন সম্ভাবনায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সুরু করেছেন রঞ্জন; হয়তো শেষ করবেন ক্রমে ক্রমে। সুরুতেই ভাষা বা চিন্তাধারার সংমিতব্যয়িতায় বইখানা লক্ষিত হয়ে থাকবে আশা করা কঠিন। মিতব্যয়িতার কথা সাহিত্যের মেরুদণ্ডের কথা, কিন্তু তবুও এ নিয়ে সাহিত্যিকদের ভেতরেও দ্বিমত রয়েছে। কেউ এক আধ কথায় অনেকখানি ব্যক্ত করবার শক্তিকেই সাহিত্যিকের গুণ মনে করেন; অন্যদের কাছে হয়তো এই মনে হয় যে সত্য সহজে প্রতিভাত হবার জিনিষ নয়—তাকে বারবার উপমা জিজ্ঞাসা কথার বিস্তারে প্রমাণিত ক'রে দেখববার চেষ্টা না করলে। লেখক এই দ্বিতীয় পথে চলেছেন; কিন্তু এ পথের বিপদ 'শীতে উপেক্ষিতা'র অনেক জায়গায় চোখে পড়ল।

যে লেখা শুধু লেখার জন্যে সেখানে লক্ষ্য নেই; স্পষ্ট লক্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়েছে লেখকের মন এ বইয়ের কোনো কোনো অংশে (মিসেস রায়ের গল্পে বিশেষ ক'রে)। স্পষ্টকে জানতে চাচ্ছেন, জীবনকে বুঝতে; নতুন ক'রে মূল্য স্থির করতে গিয়ে খুব সম্ভব যুক্তির

চেয়ে ধ্যানের উপরে বেশি আস্থাশীল হ'লেও এ বইয়ে যুক্তিচেতনা বা ধ্যানগভীরতার কোনো পরাকাষ্ঠা নেই। হয়ত প্রথম লেখা বলেই। কিন্তু অন্য এক স্তরে অনুভূতি ও চিন্তার প্রয়োজনীয় সতর্কতায় লেখা জায়গায় জায়গায় সরস হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ

বক্সা ক্যাম্প—অমলেন্দু দাসগুপ্ত। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ দাম সাড়ে তিন টাকা।

কারাকাহিনী নিয়ে বাঙলাদেশে প্রকৃত অর্থে সাহিত্য রচনা, যতদূর মনে হয়, অমলেন্দু দাসগুপ্তই প্রথম করেছেন। এর আগে যে কিছু হয় নাই তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ঠিক সাহিত্য পদবাচ্য হয়নি। এ-ধরণের গ্রন্থ-রচনায় সর্বাপেক্ষা বড়ো বিপদ, লেখকের ব্যক্তি-সত্তা সর্বত্র প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকতে বাধ্য। তার মানবিক বৃত্তিসমূহ সমেত। আর যেহেতু লেখককে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে, কঠিন নির্যাতনের স্বাদগ্রহণ করতে হয়েছে—ব্যক্তিসত্তার রোধপ্রাবল্যকে দমিত করে রাখা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

বিষয়টি একটু জটিল। এ-বিষয় নিয়ে সাহিত্যরচনা করা, সঙ্কীর্ণ রজ্জুর ওপর ভারসাম্য বজায় রাখার মতোই কষ্টসাধ্য। এবং এই কারণে তা যথেষ্ট দক্ষতার অপেক্ষা রাখে। ওই সঙ্কীর্ণ পরিসর উর্দ্ধমার্গে চলতে গেলে কিছু পরিমাণে আত্ম-সচেতনতা আসবেই। অথচ তা সত্ত্বেও মুখেচোখে তখন একটা নৈর্ব্যক্তিক সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য ফুটিয়ে রাখা দরকার। নইলে সমূহ বিপদ।

অমলেন্দুবাবুর লেখার মধ্যে সর্বত্র এমন একটি সাহিত্যিক স্বাচ্ছন্দ্য বর্তমান তাতে তিনি অনায়াসেই বিপদোত্তীর্ণ হয়েছেন। এবং 'বক্সা-ক্যাম্পে'ই প্রথম নয়। তাঁর 'ডেটিনিউ'এ এই স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত ছিল। হয়তোবা এর চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণেই ছিল। কারাজীবনের যা কিছু গ্লানি, যা-কিছু অ-সুন্দর—উত্তরজীবনে পৌঁছে আজ তিনি এমন এক অনায়াসস্নিগ্ধ প্রসন্ন মনে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারছেন যে, সেই প্রসন্ন লাবণ্যে মণ্ডিত হয়েই এ-দুখানি বই স্বচ্ছন্দ্যে সাহিত্যের কোঠায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

'বক্সা-ক্যাম্পে'র মধ্যে সর্বত্রই একটা ঘরোয়া আমেজ উপস্থিত। প্রতিক্ষণেই পাঠককে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কারাজীবনের এ-কিছু ডকুমেণ্টারী চিত্র নয়। বিষয়ের প্রাধান্যকে অক্লেশেই কেড়ে নিয়েছেন তিনি, কি ভাবে তাকে পরিবেশন করা হলো সেইটেই এখানকার দ্রষ্টব্য। ভাবটা যেন অনেকটা এইরকম : নানাজনেই তো নানা বিষয় নিয়ে সাহিত্যরচনা করছেন, কারাজীবনই বা বাদ যাবে কেন। তবে কারাজীবনটাই কিছু বড়ো কথা নয়, তা নিয়ে যে প্রকৃত অর্থে সাহিত্য-সৃষ্ট হয়েছে সেইটাই বড় কথা।

চরিত্রগুলিও অদ্ভুত ফুটেছে। ছোটোখাটো দু-একটি আঁচড়, দু-একটি ঘটনার অবতারণা—তাতে করেই গোটা মানুষটা জীবন্ত হয়ে উঠলো। এত অল্প পরিসরে এতগুলি মনুষ্যের আমদানি, এবং প্রত্যেকটি চরিত্রকেই যথাযথভাবে স্থান করে দেওয়া—এ-খুব দক্ষ নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে। 'বক্সা-ক্যাম্পে'র লেখকের সে-নৈপুণ্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

অমলেন্দুবাবুর ভাষা ঢিলেঢালা, একটুবা অযত্নশিথিল। কিন্তু তাতে বেশ একটা সহজ আলাপনের স্বাদ পাওয়া যায়। এবং সর্বোপরি তাঁর পরিহাসপ্রবণতা। এ-সব মিলে বইখানির সর্বত্রই একটি আন্তরিক তার সুর ধ্বনিত হয়েছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বাঙালী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগ। মূল্য দুটাকা চার আনা।

ইতিহাস বর্ণন ও পঠন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সাপেক্ষ। ক্ষেত্র বিশেষে তত্ত্ব ও তথ্যগত বিভিন্নতা স্বাভাবিক। তবে আজ বহু পরীক্ষা ও নিরীক্ষায় দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে—ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ একান্তভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর। এই সিদ্ধান্তই যে এক বাক্যে সকলে গ্রহণ করেছেন—তা নয়। তবে বিরোধীদলের নিজস্ব একটি বক্তব্য রীতিও আছে। কিন্তু প্রবোধবাবু কোন পদ্ধতিই অনুসরণ করেন নি।

প্রবোধবাবু তাঁর গ্রন্থে বাঙালী সমাজ বিন্যাস, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিমানসের ইতিহাসের এক ধারাবাহিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। লেখকের মূল বক্তব্য হল ; বর্ত্তমানে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ধ্বংসোন্মুখ, তথাপি আমরা যেন নিরাশ না হই। কারণ বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সাধনা বাঙালী জীবনের বৈশিষ্ট। এবং এই সাধনাই বর্ত্তমান সমস্যা বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে সাহায্য করবে। একথায় আপত্তি থাকলেও প্রবোধবাবুর ঘটনা সংস্থাপনা যদি স্ববিরোধী ও স্থানে স্থানে অর্থহীন না হত তবে প্রশ্নের অবকাশ ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে আছে, আর তা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাওয়া যায়। যেমন—"বাংলার মাটী যুগে যুগে বিদেশীকে আকর্ষণ করে এক পরিবর্ত্তনশীল সমাজ সৃষ্টি করেছে।" (পৃঃ ২) এমন বক্তব্য উপস্থিত করা সম্ভব হল কি করে ? এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি প্রসূত যে কোন দেশের মাটী বিদেশীকে আকর্ষণ করে। একথা ভাবের, যুক্তির নয়। ইতিহাস ভাবোচ্ছাসের জোয়ার নয়। কোনো স্থানের প্রতি বিদেশীর আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ঔপনিবেশিক অথবা বাণিজ্যিক সম্ভাবনার ওপর। আর বাংলা—শিল্পে যে দেশ আজও অনগ্রসর, সেখানে বিদেশীদের আগমনের কারণ ত' অতি স্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ সমাজ কখনও কোথাও স্থানুবৎ অবস্থায় স্থায়ী হয়নি। সর্ব্বত্রই এক পরিবর্ত্তনের খাতে সমাজ জীবন প্রবাহিত হয়েছে। আর এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন পদ্ধতি। অপর একস্থানে তিনি দুটি উদ্ধৃতির সাহায্যে বাংলার জীবন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

'চাষীদের ঘরে ধানের স্তূপ ; কচি খরের অঙ্কুরের সঙ্গে নীলপদ্মের যোগে ক্ষেতের সীমা যেন বেড়ে গেছে। গোরু ষাঁড় ছাগল ঘরে ফিরে নতুন খরে তৃপ্ত ; আখমাড়াই কলের শব্দে গ্রাম মুখর আর নতুন গুড়ের গন্ধে আকুল।' আর গৃহস্থ, 'গৃহকর্তা নির্লোভ, দেহতে গৃহ পবিত্র, উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাষ, গৃহিণী অতিথি সংকারে অক্লান্ত।' স্বপ্নের মত মনে হয়। কিন্তু তারই পর,—'দেহশীর্ণ, বস্ত্রজীর্ণ ; ক্ষুধায় আকুল শিশুরা আহার চায় আর দীন গৃহিণী চোখের জলে গালভাসিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান।.....ছেঁড়া কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্য বিরক্ত প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সূচ চাইছেন।' এই পরস্পর বিরোধী উদ্ধৃতি গ্রহণের দ্বারা কোন সঠিক ধারনা সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে করতে সাহায্য করে না।

এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতির অর্থও প্রবোধবাবুর কাছে স্পষ্ট নয়। তাঁর কাছে সেই কারণেই মানস চর্চার অর্থ সংস্কৃতি হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতি আসলে সমাজ জীবনের গুণগত পরিবর্ত্তনের প্রতিভাস। যা' নিরন্তর নয় পরিবর্ত্তনশীল।

গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠায় লেখক দুঃখ প্রকাশ করে বলতে চেয়েছেন, আমাদের সমাজ জীবনের নিঃস্বতা, রিক্ততা ও জীর্ণতার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে চাষীমজুরের অশিক্ষা মধ্যবিত্তের কুশিক্ষা আর ধনিকের ঔদাসীন্যে। তার অর্থ, চাষীমজুরের অশিক্ষা যেখানে থাকবে না, মধ্যবিত্তের কুশিক্ষা যেখানে অতীত ইতিহাস এবং ধনিকের ঔদাসীন্য অন্তর্হিত; সে সমাজ জীবনে নিঃস্ব-রিক্ত ও জীর্ণতার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না। আরও স্পষ্ট করে বললে এই ধারণাই হয় যে, এমন সমাজ হতে পারে যেখানে ধনিক ও চাষীমজুর স্ব-স্বার্থে বর্ত্তমান, কিন্তু ধনিক সম্প্রদায় সমাজ সংগঠনে উদাসীন নয়। ভাবতে অবাক লাগে, এমন ধারণা প্রবোধবাবুর মনকে প্রভাবিত করল কি করে? শুধু স্থান বিশেষে নয়। সর্বত্রই এধরণের বিচ্যুতি। তাঁর লেখায় মনে হয়, ইতিহাস যেন বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনার সমষ্টি মাত্র কিন্তু ইতিহাসের বক্তব্য স্বতন্ত্র। তা হল—ইতিহাস শুধু ঘটনা নয় চলিষ্ণু এক ঘটনার স্রোত। যার মূলে কয়েকটি সত্য সক্রিয়। সেই কারণেই ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে তত্ত্বীয় যৌক্তিকতা প্রধানতঃ প্রয়োজন।

লেখক স্থান বিশেষে মার্কেসর উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে মার্কসীয় মূল নীতি অস্বীকৃত, তাঁর পক্ষে সম্ভবত এই উদ্ধৃতি গ্রহণ যথোচিত হয়নি।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

স্থানাভাবে এবার 'প্রেম' এবং 'মহলা মলাট' ছাপা হলো না আগামী সংখ্যা থেকে আবার নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

Printed and Published by Atawar Rahman at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.